চিন্তামণি

মাণিক বান্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

মুদ্রাকর—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রংমশাল প্রেস লিমিটেড

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

এক টাকা বারো আনা

খিদিরপাড়া

এক

২৪ পরগণা

তাং ২০শা শ্রাবণ

বৈন চিন্তামণি তুমি ২।৩ খানা চিঠি দিয়াছ তাহা আমি পাইয়াছি। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব বলিয়া পত্রখানার উত্তর দিতে গৌণ হইল, দাদার আমশা ১ মাস যাবত ভূগিয়াছে, আমি কাহাকে লইয়া যাইব। বর্ত্তমানে অসুখ সারিয়াছে। আজ ৫।৭ দিন যাবত এখানে ঝড় তুফান হইতেছে এইরূপ অবস্থাতে আমি কি করিয়া যাইব। নৌকা যে করিয়া যাইব এমন সাধ্য আমার নাই। ২।১ দিনের মধ্যেই আমি যাইব, ওখান্ হইতে আসিয়া আমি মাল লইয়া তোমার নিকট পত্র দিব। একা লোক খালি ঘর ফেলিয়া ১টি গাভি ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাইব। এই দুর্দ্দিনে আমি তোমাকে আনিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি পেটের খুধায় মধুবণী গিয়াছ, এই দুক্ষ আমারই অন্তরে জানে। আমি কি হঁসে আছি তাহা ভগবানই জানে। উহাদের তিন জন যাওয়াতে আমার শরীলে একটুক বল পাইতেছিনা। চাঁপাবালা বসিরহাট গিয়া শ্বশুড়ের বাসায় ১৫ দিন মাত্র ছিল, উহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সোণার গয়ণা ইত্যাদি না নেওয়াতে মানে আর কি বুঝিয়া লইবে। হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। বৈশাখ মাসের ২০ তাং গিয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৭ তাং বিবাহ দিয়াছে। হেমীর মাকে বিবাহেতে লয় নাই। হেমীর মা তাহার কাকার বাড়ীতে আছে। ডাকাতের হাতে হেমীকে বিবাহ দিয়াছে ঐ শোকে হেমীর মা পাগল হইয়াছে। হেমই বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে উহার মাঐ বা কত কান্দাকাটি

করিয়াছে, কাকী ধরিয়া স্নান করায় ও খাওয়ায় এই অবস্থাতে আছে। ছেলের বাড়ী মোদের দেশে বিন্দীপাড়া বিপিনের ভাই। এই মেয়ার বিবাহে কত আমোদ আহ্লাদ করিব। তাহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়া এইরূপ কার্য্য করিল। হেম যে মায়ের জন্য কি প্রকার কান্দাকাটা করিয়াছে। তাহা আর এই ক্ষুদ্র পত্রে কি লিখিব। তবু চাঁবাকে বাড়ীতে লইল না। জামাতার মুখ দেখে নাই বিবাহের নিয়ম কাজ মায়ে করে তাহাও করে নাই। আমি এই অশান্তিতে আছি তুমি সর্ব্বদা পত্র দিবে। তোমার পাইলে পাইলে একটু শান্তিতে থাকি। মেয়ে জামাই লইয়া বাড়ীতে আসে নাই তাহার জন্য আশীর্ব্বাদ করিও। তোমাকে জানাইব। টাকা ত লইয়া যায় নাই। নবিন আষাড় মাসে ধান্যের কাজ করিয়া ১০৲ টাকা দিয়াছে কি কাজ করে জানি না। চাঁবার পত্র পাই নাই। আমার খাওয়া চলে না।

"দিদি"

চিঠি পড়ে পটল বলে, 'লেখাটি কার রে? কুচি কুচি লিখতে জানে পিঁপড়ের ঠ্যাং।'

'নন্দ গোসাই হবে। আগে নিত এক পয়সা, এখন দু'পয়সার কম কথাই কয় না। তবে লেখে বটে, হ্যাঁ। যত খুসী বলে যাও সব ধরিয়ে দেবে একখানি পোষ্টকার্ডে। একবারটি আমি ভাবনু, ঘোষ দের বাড়ীর মেজো বৌ পাশ দিয়েছে, পয়সা দিয়ে লেখাই কেন গোসাইকে দিয়ে? তা বললে তুমি হাসবে পটলবাবু, বলতে সুরু করেছি কি করিনি, মেজো বৌ বললে আর তো জায়গা নেই চিন্তামণি! এত কথা লিখবে তো খামে লিখলে না কেন?'

চিন্তামণি

'তা—তা—'

'কি হল তুমার ?'

'সত্যি কথাই বটে তো।'

'কি সত্যি কথা ?'

'খামে লেখোনা কেন ?'

'একটা পয়সা লোকসান হয়। তাছাড়া, কাগজ কই ? মাগো বাবাগো ! কি ফ্যাকড়া বেঁধেছে কাগজ নিয়ে ! না চেয়ে মিলতো আগে যত চাও ততো, চাইলে পরে খিঁচড়ে ওঠে এখন ! নবীনকে দিয়ে দিস্তে দিস্তে কাগজ হেডমাষ্টার বেচে দিত দোকানে। এবার মোটে দু'চার দিস্তে বেচলে—পায়নি তো বেচবে কি ! তা দর যা হয়েছে কাগজের, 'ক' দিস্তে বেচে লাভ কিছু কম হয় নি।'

আর কিছুর দর বাড়েনি ?'

'আ কপাল আমার !' থপ করে কপাল থাপড়ে দেয় চিন্তামণি, 'দর যদি না বাড়বে তবে দেশ-গাঁ ছেড়ে হেথায় আসি ?'

পটল ভাবে, কাণ্ড বটে ! রাঁড়ীর নাকি ঘরের অভাব, ভাতের অভাব ঘটে !—তা সে একবার হবিষ্যি করুক আর তিন বেলা খাক ? বাবুর বাড়ী কচিকাঁচার পাল, কাপড় যত আছে, ছিঁড়তে লেগেই বনে যায় কাঁথা, এমনি রাঁড়ী ঘরে পুষতে বাবু একদম পাগল। কাঁচা নয় যে খাটতে নারাজ, বুড়ী নয় যে চক্ষুশূল। এদের কত দাম এমনি সব বাবুদের কাছে !

পটল যাবে কলকাতা, তার দাদার ফিরতি বিয়ে। বাবু বললে, 'ওহে পটোল শোন, ঝি টেঁকে না জানো। বলে, পয়সা পাব বেশী, তোমার কলে খাটাও বাবু ! সবাই যদি কলে খাটবে তো ঝি কে থাকবে

ঘরে ? হিসেব বুঝিয়ে দি' জলের মত সাফ—পয়সা পাবি-বেশী, এমন খাওয়া পাবি কোথা ? কাঁকড়ে চালের মোটা ভাত দু'বেলা খেতে যে বেশী পয়সায় কুলোবে না হারামজাদি ? তা কে শোনে কার কথা। মাসটি গেলে মাইনে নিয়ে ভাগে, অন্য কলে খাটতে যায়।'

'অজ্ঞে ভালো খাওয়া ভাল্ লাগে না মাগীদের। পয়সা পেলে আধ পেটাতে খুসী।'

'মন্দো দিনকাল পটোল। সবদিক দিয়ে মন্দো। বাপের কালের ধানকল আমার, ইদিকে সেই প্রথম। আজকে ত্যাখো, দেড়গণ্ডা কল বসেছে। দু'চারটে সাঁওতাল ছাড়া যোয়ান মাগী একটা আসে না কলে! ভাদুরী ব্যাটার সয়তানী চাল আর সয়না পটোল।'

'দাঁড়ান না, ব্যাটা ডুববে।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম তোমায়। দেশের দিকে যাচ্ছ, যদি ঘর গেরস্ত এমন কাউকে পাও, আশ্রয় নেই কষ্ট পাচ্ছে, পারলে এনো দিকি একটা। খাবে পরবে ঘরে থাকবে ঘরের মানুষের মত, বাচ্চা কটাকে দেখবে আর এটা ওটা করবে। মাইনে পাবে না, ঘরের লোকের মাইনে কি? নেহাৎ যদি চায় তো না হয় দু'টো টাকা হাত খরচ বাবদ দেওয়া যাবে। বুঝলে না ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খোঁজ করব।'

'বুড়ী ব্যারামী যেন না হয় বাপু। মাঝ বয়েসী স্বাস্থ্য ভাল এমনি কাউকে এনো।'

তা হাওড়ার তার দেশের গাঁয়ে অমন কাউকে মেলে নি—বয়স আছে, স্বাস্থ্য ভাল! এমন মেয়েই কম গাঁয়ে। দুটো চারটের বেশী কোন কালে ছিল না। আজ তারা যেন কোথায় উধাও হয়েছে। উধাও

কি হয়েছে ? না রোগাপটকা বনে' গাঁয়েই আছে তাই ওই বয়না খাটে না ?

বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে গেছে কালীঘাটে, সেখানে দেখা চরণ দাসের সাথে।

একথা সেকথার পর আপশোষ করে বলে, 'ইকি ব্যাপার অাঁ ?' কমবয়সী নয়, মাঝবয়সী নাদুস নুদুস মেয়ে একটা গাঁয়ে নেই ? বাবুর ফরমাস ছিল।'

চরণ বললে, 'হালে এয়েছে গাঁয়ের মেয়েদের সাথে একটা। যোয়ান মেয়ালোক। চেনা লোকের জানা বাবুর বাড়ী খুঁজছে—'

'আমার বাবু রাখবে।'

'তোমার সেথায় ? ও খুঁজছে কলকাতায়।'

'শুধোও, যদি যায়।'

অনেক কথা, অনেক দ্বিধা, অনেক ধাঁধাঁর পর চিন্তামণি রাজী হল। শেষ মুহূর্তে চরণ বললে পটলকে, 'একটা কথা বলি। দায়ী করবে শেষে ? স্বভাব তেমন ভাল নয় শুনি চিন্তামণির।'

পটলের যেন তা জানতে বাকী ছিল ! নয়তো এই বাজারে এত বছর মিহি কোড়া থানকে ফেরতা দিয়ে পরে আর কপাল-ঢাকা ঘোমটা টেনে চাবির গোছায় ভারি রিং আঁচলে বেঁধে পিঠে ঝোলায়, যার স্বভাব ভাল ? নানা বর্ণের নানা ধাঁচের সেলানো পাড়ের ঢাকনা তার তোরঙ্গের, শোয়ার কাঁথা তোষক-সমান পুরু ! ওসব জানে পটল, ওতে যায় আসে না কিছু, ধোপা নাপিত কামারকুমার যারা, সমাজ তাদের এমনি মেয়ের কেলেঙ্কারি সয়, যদি সেটা সত্যমিথ্যা গুজব ছাড়া আর কিছু না হয়।

রাত্রিগুলি অন্ধকার। পাপ যে করে চুপেচাপে তার বিচারের ভার

সেই বিচারকর্ত্তার যার সৃষ্টি সেই অন্ধকার। হাওয়ায় ভাসা কথার বেলা সমাজ তাই কাণা। পিছে যদি কেউ লাগে আর হাতে নাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, হা গ্যাখো, তখন সমাজ দণ্ড দিয়ে বলে যে আজ থেকে তুমি পতিত হলে, প্রাচিত্তির করে যদি ভোজ দেও সমাজকে তবেই উঠতে পারো সমাজে, নইলে নয়।

চিন্তামণিকে সে পৌঁছে দিল বাবুর বাড়ী। তার বাবুর নাম নীলকণ্ঠ ঘোষাল, দুপুরুষে হরেন্‌াম রাইস মিলের মালিক।

পরদিন বাবু বললে, 'অ পটোল, এ করেছ কি? ওনা যে বলছে দুর! দুর! খেদিয়ে দাও—বিদেয় কর আজকেই? ওনার চেয়ে সাফসুরুৎ এ ঝি, চলন যেন রাজকন্যের দাসী। বললে না পিত্তায় যাবে পটোল, রোয়াকটুকু পেরিয়ে যেতে সময় লাগে নতুন বোয়ের বেশী। আমি বলি যাহোক নাহোক এসেছে যখন এ্যাদ্দূরে, থেকেই যাক একটা দুটো মাস। তা ওনা বলছে আজ নয় তো, কালকে, ওকে বিদেয় করা চাই। তুমি যদি তোমার বাসায়—'

'আমার বাসায় ঝি!' পটোল প্রায় চোখ উল্টে বলে, 'বাবু, মাইনে কিছু আর চাল কিছু যদি না বাড়ান, আধেক মাস উপোস দিতে হবে।'

বাবু চুপ। মুখে বড়ই অসন্তোষ। সব কথাতে এই কথা আনা চাই পটোলের আজকাল। একবার নয়, দু'বার নয়, দশবার। কলে যখন পূরোদমে কাজ, সব দিকে নজর রাখতে বাবু একদম অপারগ, চাল যেন পটল সরায় না তার বছর খোরাকী আর বছর পোষাকীর মত। কি করে সরায় তাই না শুধু জানা নেই বাবুর!

পটল তখন বলল, 'এক কাজ করেন বাবু। মার সামনে ধমক ধামক দিয়ে বলেন, মাইনে পাবেনি একটা পয়সা। খাওয়া পরায় থাকবে

থাকো, নইলে তুমি ভাগো বাছা। আর মাকে বলেন, মাগীর হাতে জল খেতে আপনার ঘেন্না করে, এমন নোংরা মাগী।'

বাবু কিছু বলল কি বলল না বাবুই জানে, চিন্তামণি সেই থেকে আছে। তেমন সাফসুরুৎ আর নয়, ঘোমটা অনেক খাটো, চলন বেশ জোরে।

এতদূর এসে পথের ধারে শিরীষ গাছের তলায় বসে আছে, সাইকেল চড়ে বাড়ী যাবার সময় তাকে দিয়ে চিঠি পড়াবে বলে! বাবুর বাড়ীতে যেন লোক নেই চিঠি পড়বার। বাবুর ছেলে মেয়ে একসাথে ম্যাট্রিক দিয়েছে এবার, ছেলেটা ফেল করেছে খবর এসেছে দিন সাতেক আগে। আহা, পাশ করেও মেয়েটার কি কান্না।

• 'নাক সিট্‌কানো স্বভাব বড় মেয়েটার পটলবাবু। বলেছিল বটে, চিঠি পড়ে দেব চিন্তামণি? আমি ভাবলাম, কাজ নেই বাবু চিঠি পড়ে ঘরের কথা জানাব! আমায় দাও, পড়তে জানি আমি, বলে তাই নিয়ে নিলাম চিঠিটা। ওগো মাগো কি যে তখন দেমাক দেখালে ছুঁড়ি!'

'দেমাক নাকি!' বললে পটল আর হাতল ধরে খাড়া করলে সাইকেলটাকে।

'দেমাক নয়? আকাশ থেকে পড়ে যেন আশ্চর্যির পার নেইকো এমনি করে বললে, পড়তে জানো তুমি?'

'জানো নাকি সত্যি?' উৎসুক পটল শুধোল।

'জানি নে তা ঠিক্। কিন্তু জানলে অবাক হবার কি আছে শুনি?'

সাইকেল চেপে পটল যখন অনেক দূরে গেছে তখন যেন চিন্তামণির মনটা উঠল কেমন করে। শ্রাবণ শেষের বৃষ্টি ছাড়া বাতাস-ছাড়া দিন, ভাদ্র মাসের উজল কড়া রোদে ঘাম ছোটানো গরম। পূজোর আর কটা

দিন বা বাকী। এমন দিনে এই বিদেশে সে বিদেশিনী গো! একেবারে একাকিনী সে!

ক—

লাল কাঁকড়ের পথটা এখন ধূলোর কাদায় কাদা, হেথায় হোথায় গাড়ীর চাকার গর্ত্তে জমা জল। দুপুর বলেই লোক চলাচল কম, নইলে পথে মানুষ কিছু কম চলে না। এদিক ওদিক দূরে কাছে গাঁ চোখে পড়ে ঢের, তবু যেন ক্ষেত আর ডাঙ্গায় চারিদিকটা তেপান্তরের মাঠ। ডোবা নালায় খাল বিলে ঝোপে ঝাড়ে বনবাদারে গাছ-আগাছায় ঘেঁষাঘেঁষি চব্বিশ পরগণার গাঁ, খিদিরপাড়ার চারিদিকে। ছায়া যেন আপনি নিবিড়, কচুরিপানার পাঁকাল গন্ধে ভরা। এখানে সব ফাঁকা, আশপাশের গাছগুলিকে যেন গুণে নেওয়া যায়। পথের দু'পাশে খানিক দূরে দূরে মানুষ গাছ রেখেছে, তার বেশীর ভাগই শাল, শিরীষ আর কদম,—দুদিক পানে দূরে তাকালে তবেই চোখে পড়ে তাদের সারি বাঁধা রূপ।

ক্ষেতগুলি আজ ফসলে ঢাকা, ডাঙ্গা মাঠে বড় বড় তৃণ। ঝাঁকাটি ঝোপের পর্যন্ত সরস নবীন রূপ। কালচে রাঙ্গা কাঁকর মাটির পথটি ছাড়া ক'দিন আগের এবরো খেবরো রাঙ্গামাটির শুকনো দেশ সবুজ হয়ে গেছে। অনেক দূরে শাল বনের সবুজ সেদিনও ছিল, লাল মাটির ধূলোয় যেদিন এই শিরীষ গাছের পাতা পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল লাল।

প্রথম বর্ষণে তখন গাছের পাতার ধূলো ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। কোন ক্ষেতে লাঙ্গলের মুখে মাটি উঠছে ডেলা ডেলা, মই লাগিয়ে ভাঙ্গতে হবে। কোন ক্ষেতে, হয়তো ঠিক পাশের ক্ষেতেই লাঙ্গলের ফলা ডাবছে না মাটিতে। বড় বড় ফাটল ছিল এ ক্ষেতে শোঁ শোঁ করে জল শুষে নিয়েছে, সবটা ক্ষেত নরম হয়নি।

চিন্তামণি

গৌরাঙ্গের বড় ক্ষেতটার একপাশে একটুখানি জমিতে লাঙ্গল চলল, তাইতে কাহিল হয়ে পড়ল বলদ দুটো। লাঙ্গল যেন নোঙর হয়ে ঠেকে যাচ্ছে।

'খেটে দি' চাঁদকাকা ?'

'না।'

চন্দ্রকান্ত গৌরাঙ্গের আসল কাকা, সম্প্রতি ভাইপোর সঙ্গে ভিন্ন হয়েছে। ভাবে ভাবে ভিন্ন হওয়া, ঝগড়া বিবাদ নালিশ ফরিয়াদ কিছুই ঘটেনি। মাসেক পরে কি কারণে চাঁদের মন বড়ই বিরূপ হয়েছে ভাই-পোর 'পরে। কেন যে তার মন বিগড়েছে অনেক ভেবে গৌরাঙ্গ তার হদিস পায়নি। আকাশ থেকে যেন মনোমালিন্য নেমেছে তাদের মধ্যে। কথা কয় না, খবর নেয় না, গৌরাঙ্গ যদি বা বাড়ীতে যায় তো কাকী পর্য্যন্ত বলে না যে, আয়রে বাপা, বোস

আরেকটু জল না পেলে ক্ষেতে তার কাজ চলবে না। বলদ তার নেই, ফের সেদিন ভাড়া করতে হবে। সারাটা দিন সামনে পড়ে আছে, কারও ক্ষেতে আজ খেটে দিলে একটা দিনের হাল বলদ আর খাটুনি তার পাওনা হয়ে থাকতো।

জোড়া বলদের বদলিতে কাকা তাকে তিন বিয়োনীর গাই দিয়েছে একটা আর একটা মদ্দা বাছুর। ঠকিয়েছে নাকি তাকে তার চাঁদকাকা ? খেটে দিতে বারণ করল কেন ? কাজ ফুরিয়ে গেলেও বলদ জোড়া দেবে না নাকি তাকে ?

'কাল তুমার শেষ হবেনি চাঁদকাকা ?'

'হবে। তাই কি ?'

'আরেক বর্ষা নামলি মোরে বলদ জোড়া দিও।'

'মোর কাজ নেই কো? আদুলির ডাঙ্গা জমিতে হাল দিতি যাব আরেক বর্ষায়।'

'আদুলির নামা জমি? কুথা পেলে বটেক তুমি, আঁ?'

'কিনতে পারি। পেতি পারি। জুটতি পারে। তোর কাজ কি অত খপর নিয়ে? তোর বাপের জমি নয়।'

আদুলির নামা জমি বিলি হয়েছে সতর বিঘা, চড়া সেলামীতে। টাকা থাকলে গৌরাঙ্গও দু'এক বিঘা নিত। কিন্তু কাকা তার টাকা পেল কোথায়? ক'বিঘে জমি সে নিয়েছে? ভিন্ন হবার এতদিন পরে হঠাৎ আজ গৌরাঙ্গ ঈর্ষার তীব্র জ্বালা অনুভব করে। এইজন্য—শুধু এইজন্য চাঁদকাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। চাঁদকাকা সম্পত্তি বাড়াবে, বড়লোক হবে!

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ ভাবছিল, খানিকদূর থেকে ব্যাপার অনুমান করে রঘু সামন্ত হাঁক দিল, 'খাটবি নাকি গৌর?'

'খাটতি পারি।'

'আয়।'

গৌরাঙ্গ খুশী হয়ে জোয়াল থেকে বলদ দুটিকে মুক্তি দিল। লাঙ্গলটা কাঁধে তুলে বলদ তাড়িয়ে খাটতে গেল রঘুর জমিতে।

বীজধানের অভাবে এবার অল্প বিস্তর সবাই কাতর। অনেক চাষীর এ অভাবটা চিরস্থায়ী দায়, কোন বছর বাদ যায় না। বীজধান তুলে রাখে, আশা করে এবার হয়তো হাত না দিয়েই চালানো যাবে খেটে খুটে পয়সা কামিয়ে ভগবানের দয়ায়। বীজ যে লক্ষ্মী সবাই জানে, এক-মুঠো ছড়িয়ে দিলে ফিরে আসে দশ মুঠো হয়ে। কিন্তু প্রতি বছর পেটের জ্বালায় শেষ মুঠোটি উজার হয়,—যদিও পেট তখনো জ্বলে। খুঁজে পেতে

কেঁদে কেটে বীজ যোগার হয়, অবিশ্বাস্য চড়া ধানের সুদে। এবার এই স্বাভাবিক অভাব নয়, ফাঁদে পড়া সর্ব্বজনের সার্ব্বজনীন অভাব। চাষীরা সব চিরকালই চাষী, চাষাড়ে জ্ঞান, চাষাড়ে মতিগতি। ধানের দাম এমন চড়ে গেল যে দাদা, বাপ আর নিজে এই তিনপুরুষে তেমন শুধু স্বপন দেখা ছিল। ধানের এমন দাম চড়া মানেই চাষীর লক্ষ্মী বাড়া—চাষীরা জানে এ ছাড়া আর অন্য নিয়ম নেই, অন্যথাও নেই। সোজা হিসাব, সোজা নিয়ম, প্যাঁচ থাকবে কোথায়? তিনের দরে একমণ বেচে তিন টাকা পাই, সাতের দরে একমণ বেচে পাই সাত টাকা। চারটে নগদ টাকা, কড় কড়ে চারটে নতুন ছাপা নোট যে বেশী পাই তাতে কি আর সন্দেহ আছে ভাই?

হবের্ণাম রাইস মিলের নীলকণ্ঠবাবু, ভাদুরী রাইস মিলের জলধরবাবু আর মভার্ণ রাইস মিলের বিনোদবাবু তিনজনেই দর বাড়ায়, কিন্তু তাদের চেয়ে চড়া দর দেয় অজানা অচেনা বিদেশী কজন লোক! মানুষ তারা অচেনা বটে কিন্তু তাদের টাকাগুলি চেনা। ধান নিয়ে তারা পালিয়ে যায় না, গাড়ী বোঝাই দিয়ে রাইস্ মিলেই ধান নিয়ে ফেলে। খালি মধুবনীর তিনটে মিলে নয়, সাত ক্রোশ দূরে গোদাপাড়ার মিলে পর্য্যন্ত যায়। গোদাপাড়া যায়গা ছোট, মিলটা কিন্তু মস্ত আর একেবারে রেল লাইনের ধারে।

উদ্ধশ্বাসে কল চালাতে সুরু করে তিনটি মিলের তিনটি বাবুই যেন ধান কিনতে উদাস ভাব দেখায়। যেমন তেমন ছাঁটা ধুলো কাঁকর মেশাল দেয়া চালগুলি প্রায় চালান হয়ে এলে, মিলের কাজে কমবেশী ক্ষান্তি পড়ে গেলে, তিনটি বাবুই দর কমিয়ে ধানের দাবী জানায়, পাওনা ধান, ঋণের ধান, ছাঁটাই করে চাল ফিরিয়ে দেবার ধান।

দাদন যারা দিয়েছিল তারা অনেকে চেয়ে চেয়ে পুরাণো দরে ধান পায়নি, টাকার গরম চাষীর তখন মগজে ছুঁয়েছে। বলে দিয়েছে, সুদে আসলে টাকা ফেরত নাও, ও দরে আর ধান পাবে নি। কিন্তু দাদন নিয়ে কি চাষী রেহাই পায়? দাদনদার চেপে ধরে ভয় দেখিয়েছে যে দাদন ঋণ নয়, গচ্ছিত ধান বেচে দেওয়া চুরির সামিল পাপ—ধান না দিলে ফৌজদারীতে একেবারে জেল! ধান যদি নেই, হিসাব মত বাজার দরে পাওনা ধানের দামটা দিয়ে দাও!

চাষীর হাতে টাকা এসেছে ঢের। যাই বাড়ুক তার খাজনা বাড়ে নি। সবাই ভাবছে, এতদিনে চাষীই এবার সুখী, খাজনা দেবার খরচটা সে টেরও পাবে না। কিন্তু বাঁধা খাজনার বাঁধন অটুট রেখে জমিদার যে চাষীর লাভে ভাগ বসাতে পারে এ হিসাবটা সবার ফস্কে গেছে। আইন রেখে আইন ভাঙ্গার পেশায় যিনি মেডেল-যোগ্য গুণী, তিনি যেন প্রজারই ধনলাভে খুসী হয়ে ঘুমোতে পারবেন।

জমিদারও খাজনা চাইলে,—ধান। ভুলানো নয়, ঠকানো নয়, টাকার বদলে ধান! আগের চেয়ে দাম বেড়েছে ধানের? বেশ, আগের চেয়ে একেবারে একটাকা বেশী ধরো। জমিদার যে অবুঝ তাও নয়ঃ ধান যার নেই সে টাকায় খাজনা দিক্, কি আর করা যাবে।

ধান যার কম আছে সে টাকায় আর ধানে দিক, কি আর উপায় আছেঃ

ধান যার আছে তার ভাবনা কি, ধানেই খাজনা শোধ!

ধানের তাই বড় অভাব ঘরে ঘরে। বীজধানেরও চমক্‌প্রদ অভাব।

সদরে বীজ ধান দেওয়া হচ্ছে। গৌরাঙ্গ, রঘু আর সদয় সামন্ত সদরে গেল বীজধান কিনতে। তিনজনেই চাষা কি না, বীজধান দেখে তাই তিনজনেরি সে কি জবর হাসি!

দম নিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, 'যে ধান গাছে তক্তা হয়, এতে সেই গাছ হবে।

চাপরাসী কান ধরে তাদের বার করে দিল।

অনেকেরই বীজধান ছেল না, তবু দেখা গেল শেষপর্য্যন্ত আবাদের জন্য তৈরী সমস্ত জমির জন্য যত বীজধান দরকার ছিল যোগাড় হয়ে গেছে। বীজধানের জন্য সামান্য যা কিছু ছিল বাঁধা পড়ল, ঋণের বোঝা বেড়ে গেল, যারা কিনল বীজধান—জমির আগামী ফসলের মোটা অংশই মহাজনের কবলগত হয়ে গেল অনেকের। সরকারী কৃষি বিভাগের লোভ, লাভ ও অব্যবস্থার স্তর থেকে মহাজনের ঘর থেকে বীজধান নেমে এল আগামী দুর্দ্দশার বীজ হয়ে চাষীদের ঘরে। অন্য সমস্ত কিছুই যেমন যার যত দরকার তার তত জোটে না,—কয়েকজন পায় অনেক, তার চেয়ে বেশী কয়েকজন পায় যথেষ্ট এবং অধিকাংশই পায় কম—প্রাণপাত সংগ্রহ প্রচেষ্টার ফলে চাষীদের বীজধানও ঘরে এল সেই নিয়মে।

বুড়ো হারাণের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে, তিন বিঘে বাঁজা হয়ে থাকবে উর্ব্বরা বিধবা মেয়ের মত। হারাণকরে কি: তিনুর কাছে গেল। তোমার অনেক বিঘে জমি তিনু, শ' বিঘে হোক তাই কামনা করি, লক্ষ্মীমন্ত হও। তুমি দানা পেয়েছো ঢের, ভাল সরকারী দানা। তোমার দীনু ভাইটি তকমাধরী চাপরাসী, আহা, তার ভাল হোক, তোমার ভাল হোক। তুই আমার বাপ তিনু, আমার জন্মদাতা বাপ, গড় করছি তোর দু'টি পায়ে, আমায় দানা দে। দাম নে, নগদ নে বেশী নে, কিন্তু দে।

তিনু। নেই।

হারাণ। আছে বাবা, আছে। ভাই তোর চাপরাসী, তোর নেই তো আছে কার?

তিনু। বাড়তি নেই।

হারাণ। দামও বেশী নে বাবা, দু'আনা ফসলও নিস্।

তিনু। জমি দাও, তিন আনা তুমি পাবে।

হারাণ। শালা! চোর! খচ্চর।

তিনু। ভাগ্ তবে ব্যাটা বুড়ো বাঞ্চোত্ ভাগ্। মেঁথি ঘাস রুয়ে দিবি যা, মাগনা পাবি। বোঝায় বোঝায় বেচবি ঘাস।

হারাণ। অ বাবা তিনু, একটু বিবেচনা করো বাবা। দয়া ধম্মো করো বাবা একটু। মোর জমি, মোকে তিন আনা দিবি, ই কি একটা কথা হল রে বাপ্?

তিনু। তিন আনাই তো মাগনা পাবে, মফত্ পাবে। একপাই জুটবে তোমার জমি ফেলে রাখলে? আচ্ছা যাও, রুয়েটুয়ে খেটেখুটে সব করবে, চার আনাই দেবো তোমায়।

সময় নেই, উপায় নেই যে আর দশ যায়গায় চেষ্টা করবে। যত চেষ্টা সম্ভব ছিল সব সমাপ্ত হয়ে গেছে। তিনু শুধু মহাজন নয়, চাষী মহাজন, গত সনে তার প্রত্যাশা ছিল না, আগামী সনেও তার প্রত্যাশা নেই যে তিনুর হিসাব, বিবেচনা আর দরদ থাকবে মহাজনের মত, সতই সেটা হে ক নিজেরই স্বার্থের হিসাব আর বিবেচনা, মেকি দরদ। তিনু মহাজন চাষী, তিনু তার শত্রু। স্বার্থের সংঘাতে ভাই যেমন শত্রু হয় ভাই-এর। তিনু তাই হারাণের জমি পেল আগামী ফসলের চার আনা ভাগের ভাড়ায়। খাজনার দায়িক হল না, ফলাবার শ্রমিক হল না, শুধু হল উর্বরতার মালিক। দাঁও মারার গৌরবে তিনু পুলকিত হয়ে রইল এবং হারাণের তিন বিঘে জমিতে ঘাস গজানোর বদলে ফসল হল!

চিন্তামণি

এমনি অনেক রকমারি জটিলতার ভূমিকা তৈরী হবার পর সব ক্ষেতে ফসল ফলেছে। ফলেছে ভালই। বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে নিবিড় সতেজ তরুণ তৃণে, মোটা মোটা শীষের গোছ্ এদিক ওদিক দুলছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মন কেঁপে কেঁপে ওঠে। আতঙ্ক জড়িত ক্লেশের মত একটা অনুভূতির খোঁচায় সর্ব্বদা মনে হয়, এ ফসলে কারো পেট ভরবে না। এ শুধু ফসল, অন্ন নয়। দাদ চুলকানোর আরাম ভুলে চাষীরা মাথা চুলকায়। ভাববার ও বুঝবার চেষ্টা করে যে এসব কি ব্যাপার। ধারণা করার ক্ষমতা দিয়ে কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, শুধু গত দিনগুলির অভিজ্ঞতা তাদের ব্যাকুলতা এনে দেয়, অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের সাড়া জাগায়। কি একটা প্যাঁচে যেন তারা পড়েছে, কি যেন মুস্কিল ঘটবে তাদের, বিপদ আসবে। অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে, দুর্ভোগ চড়ে নামে, ওসব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উল্টোপাল্টা, গোলমেলে, অদ্ভুদ ব্যাপার ঘটছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভাল ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের যাতনা ভোগ। জমিদার মহাজন উকীল ডাক্তার দোকানী পশারী আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের কারবার, কটা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিৎ নিষ্ঠুরতায়, লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য— আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরো তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে

কে জানে এসব কিসের সূচনা, কি আছে তাদের ভাগ্যে!

বৈম চিন্তামণি.

তোমার যে পত্রখানা দিয়াছ ইহাতে পরম সুখী হইয়াছি। অদেষ্টে সুখ নাই আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। কে দিবে যে আমার মন্দ অদেষ্ট আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। আমার জমিটুকু ৺ওনার বড় ভাই জোর করিয়া গার দাপটে ভোগ দখল করেন তুমি জানিবা এবং কতকাল আমার বলিবার কিছু মুখ নাই কারণ গুরুজন বেটাছেলা তাঁহার অমান্য করিলে লোকে থুথু দিবে। বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া এবার বলাইলাম যে এই দুর্দ্দিনে আমার ভাগ দিবেন আমি এতকাল চাই নাই এখন ভাগ না পাইলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। পেটের খুধায় তুমি মধুবনী গিয়াছ বলিয়া আমার অন্তরে কত দুক্ষ জানিয়া গ্রাহ্য করিল না। সাফ জবাব দিল এমন পাষাণ। আমি কত সাধাসাধি করিলাম দাদা গিয়া কিছু বলিল না। ১ মাস যাবত আমাশায় ভুগিবার কালে কত সেবা করিয়াছি, গু মুত ঘাটিতে ঘিন্না করি নাই। বর্ত্তমানে অসুখ সারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না। বৌ আংটি চাহিয়াছিল আমি দিই নাই তৎকারণে শত্তুর হইয়া আছে তুমি জানিবা, বৌর পরামর্শ দাদাকে বিরাগ করিয়াছে। আংটি বাঁধা দিয়া টাকা লইয়াছি আমি কেমন করিয়া আংটি দিব। বৌর কথায় মার পেটের বৈনকে ভাসাইয়া দিল। দাদা বলিল না আমি কি করিব, বিন্দিপাড়ার বিপিনকে দিয়া ৺ওনার বড় ভাইকে বলাইলাম। বিপিনের ভাইর সঙ্গে হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। ডাকাতের হাতে মেয়ের বিবাহ দিয়া কি অশান্তিতে আছি আমারই অন্তরে জানে। দাদা বলিল না আমি কি করিব। বিপিনকে বলিলাম সে গিয়া বলিল। আমি মেয়ালোক কেমন করিয়া বলিব। জামাই হেমীকে লইয়া কাকীর বাড়ীতে চাঁপাবালাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল। মাত্র ২ দিন ছিল। কাকী পত্র লিখিয়াছে জামাই

চিন্তামণি

শাশুরিকে প্রণামি ১ খান কাপড় দিয়াছে তাহা গামছার মত। সোনার গহনা ইত্যাদি চাহিয়া অনেক গোলমাল করিয়া হেমিকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। জোর করিয়া বিবাহ দিয়া চাঁপাবালার শ্বশুড় এইরূপ কার্য্য করিল। কাকী চাঁপাবালা আর হেমীকে রাখিতে পারিবে না বলিয়াছে। শ্বশুড়ের কাছে টাকা চাহিতে গিয়া পায় নাই, দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে এমন শ্বশুড় দেখি নাই। গোঁসাই ঠাকুর বলিতেছেন আর কুলাইবে না অধিক আর কি লিখিব। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব না, কেমন করিয়া যাইব। নবিন ধানের কাজ করিয়া টাকা পায় নাই। নূনা জলে ধানের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তুমি সর্ব্বদা পত্র লিখিবে। আমার খাওয়া চলে না। তুমি পেটের খুধায়

'দিদি'

দুই

রঘুর অবস্থা এদের মধ্যে একটু ভাল। বছরের বারোটা মাসেরই খোরাক তার জোটে, ছেলেপুলে আর বুড়ো বাপ একটু দুধ পায়, ঘরের চালা ঝাঁঝরা হয়ে জল পড়ে না, মাঝে মাঝে সকলে নতুন কাপড় পরে, মেয়েরা চুলে তেল দেয়।

রঘুর দুটি বৌ, বিরজা এবং দুর্গা। বিরজা বড় বৌ, দশ এগার বছর স্বামীর ঘর করছে। দুর্গা এসেছে তার বছর চারেক পরে। বয়সে বিরজা তার সতীনের চেয়ে বড় হবে কিনা সন্দেহ, হয় তো বা ছোটই হবে দু'এক বছরের। তবে কিনা চাষী গেরস্ত ঘরে অত বছর গুণে বয়সের হিসাব রাখার গরজ কারো নেই, দরকারও হয় না। যে বয়সে বিরজা যতখানি বিয়ের যুগ্যি হয়েছিল তার চেয়ে চার বছর বেশী বয়সেও দুর্গা সে যোগ্যতা পায়নি।

আকারে বিরজা দুর্গার চেয়ে অনেক বড়, লম্বায়, চওড়ায়, মাংসের সংস্থানে। ছোটখাটো বেঁটে আর রোগা প্যাটকা চেহারা দুর্গার। অনেক চেষ্টায় দেড়মাস জীইয়ে রাখবার মত একটা খুদে ছেলে বিয়োবার পরেও তার বিয়ের সময়কার চেহারা বিশেষ বদলায় নি, শুধু মুখখানা একটু প্যাঙাসে মেরে গেছে, উপোসীর মত। বিরজার ছেলেমেয়ে হয়েছে মোট সাতটি, তার মধ্যে তিনটি বেঁচে নেই। বিরজার এই বাড়াবাড়ির জন্যই দুর্গাকে রঘুর বিয়ে করা, ঘন ঘন দীর্ঘকালের জন্য শূন্য শয্যার ফাঁকা অসম্পূর্ণ জীবন তার সয় নি। নইলে বিরজার জন্যই চিরদিন তার দরদ বেশী। বিরজা তার প্রথম বয়সের সোহাগিনী, তার

ছেলেমেয়ের মা, তার সঙ্গে কি অন্য কারো তুলনা হয়! আজও সেই তার সব, বাড়তি একটা বৌ ছাড়া দুর্গা আর কিছুই নয়।

ঈর্ষায় আতঙ্কে বিরজা প্রথমে ক্ষেপে গিয়েছিল। তারস্বরে ঘোষণা করেছিল যে সতীনকে মেরে নিজে সে বিষ খেয়ে মরে যাবে, তারপর রঘু যেন আবার বিয়ে করে, দশটা বিশটা বিয়ে করে, বিয়ের সাধ মেটায়, সে কিছু বলতে আসবেনা। দুর্গা কে দেখে, রঘুর মন বুঝে, নিজের যা কিছু ছিল সব বজায় আছে এবং থাকবে জেনে, শেষে বিরজা শান্ত হয়েছিল। তার মনে আর কোন ক্ষোভ থাকে নি। তাকে ছেড়ে তাকে ভুলে ছেলে তার খেলার পুতুল নিয়ে মেতেছে দেখলে তার যেমন স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় জাগে, রঘুর আবার বিয়ে করাকেও সে তেমনি তার জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা করার ছেলেমানুষী বলে গ্রহণ করেছে। চারিদিক বিবেচনা করে মনে মনে বরং একটু খুসীই হয়েছে বিরজা, স্বস্তি বোধ করেছে। পুরুষ মানুষের আলগা সখের জন্য এই ব্যবস্থাই মন্দের ভাল। স্বভাব বিগড়ে পুরুষ সংসারধর্ম্মে উদাসীন হলে বড় বিপদ ঘটে, তার চেয়ে এ অনেক ভাল। আর যাই হোক, ঘরমুখো মানুষ এতে ঘরমুখোই থাকে।

দুর্গাকে বিরজা শাসন করে, কেটে ছেঁটে তার অধিকার খর্ব্ব করে রাখে কিন্তু তেমন কিছু অত্যাচার করে না। রঘুর পক্ষপাতিত্বই দুর্গাকে সতীনের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে। বিরজা যাই করুক তাকেই রঘু চিরদিন সমর্থন করেছে, কখনো ভুলেও দুর্গার পক্ষ নেয় নি। দুর্গাকে বেশী কষ্ট দেবার তাগিদও বিরজা তাই কখনো অনুভব করে নি।

দুর্গাও বিরজার মন যুগিয়ে চলে, তার হুকুমে ওঠে বসে। ভারি ভারি কাজ করা তার শক্তিতে কুলোয় না, ছোটখাট খুঁটিনাটি কাজ

সে অবিশ্রাম করে যেতে পারে। ছেলেমেয়ে গাইবাছুর নিয়ে যে গেঁয়ো চাষীর সংসার সেখানে এরকম কাজেরও অভাব নেই। বিরজার সেবাও দুর্গা করে, তার চুলের জট ছাড়িয়ে, পিঠের ঘামাছি মেরে, পায়ের হাজায় তেল লাগিয়ে। এতে তার আপশোষ কিছু নেই। মনে নালিশ পূরে রেখে বিরজাকে সে খুসী রাখতে চেষ্টা করে না, সতীনের মন যোগানোর স্বভাবটা তার আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। পায়ের নীচে দাঁড়াবার মাটি কোথায় নরম, কোথায় শক্ত টের পাওয়ার মত স্পষ্টভাবেই পরাশ্রয়ী মেয়েমানুষ জানতে পারে কোথায় তার আশ্রয়। মানিয়ে চলাটা তাদের মজ্জাগত ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়।

রঘুর অবাধ্য হতে দুর্গা ভয় পায় না, কসুরও করে না তাকে চাপা গলায় দু'চারটে মন্দ কথা শুনিয়ে দিতে। কিন্তু বিরজার সব কথা সে মেনে চলে। নির্ব্বিচারে মেনে চলে।

এবার এক কাণ্ড করে বসেছে এই দুই সতীনে। দু'জনে পোয়াতি হয়েছে প্রায় এক সঙ্গে। ক্ষেতে ফসল কাটার কাছাকাছি সময়ে তাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা।

সে পর্য্যন্ত টিকে থেকে দুর্গা যদি অবশ্য হাঙ্গামাটা সইতে পারে। দুর্গার শরীর বড় খারাপ, তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দিতে হয়েছে। সময় আসা পর্য্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ জেগেছে সকলের মনে এবং এ বিষয়ে সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে যে কোনরকমে ততদিন বেঁচে থাকলেও প্রসবের ধাক্কাটা সে সামলাতে পারবে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সে মারা যাবে।

ডাক্তার কবিরাজ একথা বলেনি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজেরাই তারা জেনেছে। বাড়ীর মানুষ শুধু নয়, গাঁয়ের মেয়েরাও দেখতে এসে

সায় দিয়ে গেছে এই আন্দাজে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক যারা মরে ছেলে হবার সময় এমনি অবস্থাই তাদের হয় শরীরের প্রথম থেকে। এমনি যারা বেশ সুস্থ সবল তারাই এরকম অবস্থা হলে আর বাঁচতে পারে না, দুর্গা তো চিরদিন দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবি।

আপদ চুকে যায় তো যাবে, বিরজার মনে হয়েছে একথা। এরকম অনেক কথাই মানুষের মনে হয়, অধিকাংশ সময়েই কিছু তাতে এসে যায় না। তাছাড়া, ওকথা মনে হওয়ার মানে এই নয় যে আপদ চুকে যাবার প্রক্রিয়াকে বাতিল করার জন্য চেষ্টা করতে সাধ জাগবে না। বিরজা নিজেই গরজ করে রঘুকে দিয়ে দুর্গার চিকিৎসার জন্য মথুর ডাক্তারকে আনাল।

মথুর ডাক্তার বলল, 'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। নাড়ী একটু দুর্ব্বল, জ্বরের লক্ষণটা ভাল নয়। এরকম পেট খারাপ থাকলে চলবে না। তা, একরকম ঠিক হয়ে যাবে ও সব।'

মথুর ডাক্তারের অভয়বাণী শুনে রঘু হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারের পরীক্ষার সময় সেও কাছে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দুর্গাকে দেখেছে। তারও জানা ছিল দুর্গা এবার মরতে পারে, আজকেই দুর্গা তার নজরে পড়েছে কয়েকবার, অথচ সে সত্য সত্যই জানত না এমন বিশ্রী হয়ে গেছে তার ছোট বৌটার চেহারা। গলা পর্য্যন্ত কাঁথা ঢাকা দিয়ে চিৎ হয়ে দুর্গা বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে, পেটটা শুধু তার উঁচু। শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দুটি কোটরে জ্বরের ধকে জ্বল জ্বল করছে কালো দুটি চোখ। বাড়ীতে ডাক্তার এলে এমনই মনটা দমে যায় মানুষের, ভুলে যাওয়া রোগ শোক অজানা বিষাদ হয়ে ঘনিয়ে আসে, সমবেদনায় থমথম করে অনুভূতির জগত। দুর্গার দিকে চেয়ে থেকে তার যে কঠিন অসুখ হয়েছে অনুভব করে রঘুর ভেতরে অস্থির

অস্থির করছিল। মথুর ডাক্তারের মুখে রোগের আশাপ্রদ আলোচনা শুনে সেটা ভয়ে পরিণত হয়ে গেল।

'বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?'

'বাঁচবে না? কেন, ওর হয়েছে কি! ছেলেপিলে হবে বলে একটু যা ভাবনার কথা, নইলে অসুখ তো সেরে যাবে দু'দাগ ওষুধে।'

ওষুধ লিখে দেবার কাগজ বাড়ীতে না পাওয়ায় মথুর চটে গেল। রোগের এই মরশুমের সময় চারিদিকে তার অসংখ্য রোগী, তার কি বসে থেকে নষ্ট করবার মত সময় আছে!

'দাও বাপু, ওই ঠোঙ্গাটা এগিয়ে দাও।'

ঠোঙ্গার কাগজেই মথুর ওষুধ লিখে দিল। তার নিজের দোকান থেকেই ওষুধ আসবে। এমনভাবে সে প্রেসক্রুপসনে লেখে যে সে ছাড়া আর কারো পড়বার ক্ষমতা থাকে না। অনেকদিন কম্পাউণ্ডারী করে মথুর ছোটখাট একটি ওষুধের দোকান খুলে সস্তায় ডাক্তারী আরম্ভ করেছিল, চাষী মজুরদের মধ্যে তার খুব পশার। ফি সে যে শুধু কম নেয় তা নয়, তার সঙ্গে দরদস্তুর করে আরও দু'চার আনা কমানো যায়, পয়সার বদলে ফলমূল ধান চাল দুধ দই দিয়েও তার পাওনা মেটানো চলে। চাষীরা তাই অত্যন্ত পছন্দ করে তাকে। যাবার সময় মথুর বলে যায়, 'শুধু বার্লি আর ওই ফুডটা খাওয়াবে বাপু। যেমন বললাম তেমনি করে খাওয়াবে। ফুডটা কোথায় পাবে জানি না আমার কাছে নেই। পাও যদি তো দাম দিতে কান্না আসবে, তাও বলে যাচ্ছি আগে থেকে। কিন্তু ওটা চাই। গায়ে জোর নেই কো একদম, পেটে কিছু সইবে না, ওটা এনে খাওয়াতে হবে। দুধটুধ ভাতটাত আর দিওনা কিন্তু, খবর্দ্দার!'

চিন্তামণি

রঘু নিজের মনে খানিক চিন্তা করে বলে, 'হ্যাঁ, শালার ডাক্তার ভালো। ঠিক ধরেছে। ছোট-বৌ, শুনছ? যা তা খেয়ো নি।'

চিঁ চিঁ গলায় দুর্গা বলে, 'খেতে দেয় নাকি মোকে? খিদেয় মরে যাই না?'

রঘু বিরজার মুখের দিকে তাকায়।

বিরজা মাথা নেড়ে বলে, 'চোখের খিদে। কাঞ্চার হয়েছিল মনে নেই? যেমন খায় ঠিক তেমনি সব বেরোয় আর সারাখন খাই খাই করে মরে? কতো খাওয়ানু তবু পাঁকাটি হয়ে গেল না অমন ছেন্যা মোর, মরে গেল না! চোখের খিদে মরণ খিদে। বার্লি তোলা রইতে পারে একটুকু, ফুটিয়ে দিচ্ছি, খাওয়াও না কেনে।'

বিরজা যেন রাগ করেই বার্লি ফুটিয়ে আনতে যায়। কিন্তু রঘু জানে এটা তার রাগ নয়। মৃত সন্তানের কথা মনে পড়লেই বিরজার সব কথায় কলহের সুর আসে, দুপ দাপ পা ফেলে সে হাঁটে। দুর্গার কাছে গিয়ে রঘু তার কপালে হাত দিয়ে জ্বর অনুভব করে, হাতের তালু এবং উল্টো পিঠ দুদিক দিয়েই জ্বরটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। মথুর ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে বলে গেছে জ্বর কত, কিন্তু রঘুর কাছে স্পর্শ না করে তাপ টের পাওয়ার কোন অর্থ নেই। একশো তিন বেশী জ্বর তা সে জানে, কেমন ধারা বেশী সেটা তো জানতে হবে গায়ে হাত দিয়ে।

হ্যাঁ, কপালটা পুড়ে যাচ্ছে দুর্গার। গলার নীচে বুকের তাপটাও রঘু পরীক্ষা করে। ডান হাতটি বার করে দুর্গা গায়ের কাঁথার ওপরে ফেলে রেখেছিল, মরা সাপের মত হাত। মায়া দেখাতে নয়, তাপ দেখবার জন্যেই সে হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে রঘুর যেন ধাঁধাঁ

লেগে যায়। নিজের পরিপুষ্ট সবল হাতের মস্ত থাবায় এইটুকু হাত নেতিয়ে আছে দেখে দুর্গাকে তার খানিক আগের চেয়েও অনেক ছোট্ট, অনেক ক্ষীণ মনে হয়। একটু হতভম্ব হয়ে থাকে রঘু, তার গা ঘিন ঘিন করে। কিছুদিন আগে চাঁদ মাইতির আট বছরের মেয়েটাকে নিয়ে গাঁয়ের ভূতনাথ সা'র কীর্ত্তির কথাটা মনে পড়তে থাকে। ভূতনাথের জেল হয়েছে সাত বছর। যত সে নিজেকে বোঝায় যে এ তার বিয়ে করা বৌ, বয়স এর কম হয় নি, অনেককাল এ তার ঘর করেছে, একবার মা হয়েছে তার ছেলের। ততই যেন শায়িতা দুর্গা ম্যালেরিয়ায় পেটমোটা কঙ্কালসার কচি একটা মেয়ে হয়ে তার আরও বেশী ঘেন্না ধরিয়ে দেয়।

বার্লি করে এনে বিরজা দেখল রঘু বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

ষ্টেশনের কাছে বাজার, সেখানে সবগুলি দোকান খুঁজে ফুড মিলল না। হাফেজের মনোহারী দোকান আর রামশরণের ডিসপেন্‌সারীর সমান কিছু এ অঞ্চলে নেই। ফুডটা দু'জনের দোকানেই ছিল, কিন্তু বিক্রী করার গরজ ছিল না মোটেই। এসব জিনিষের দাম তখন দিন দিন চড়ছে চোরাবাজারে।

'এ যে মুস্কিল হ'ল গৌর?'

'সদরে গেলে হয়।'

দুর্গাকে দেখে অবধি গৌরাঙ্গের চোখ দুটি ছলছল করছিল। বয়স তার বেশী হয় নি, যদিও সাধারণ হিসাবে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে অনেকদিন। রঘু সদয় তিনুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যতই কাবু

হয়ে পড়ার ভান করুক, বিয়ে করতে পারেনি বলে সংসারের ভাবনাগুলি তার এখনো খুব হাল্কা। এক মা, এক বিধবা ভাজ আর তিন ভাইবোনের ভার অবশ্য কম নয় তার মত গরীবের পক্ষে, এই ভারেই সে নির্ঘাত কাবু হয়ে পড়বে কয়েক বছরের মধ্যে, যদি না তার আগেই ওদের মরণ বাঁচন সম্বন্ধে উদাসীন হতে শিখে যায়। গৌরাঙ্গের চেয়েও অনেক বেশী কোমল হৃদয় যুবকের যে উদাসীনতা আসতে দেখা গেছে। বৌ আর ছেলে মেয়ের ভালমন্দ সম্বন্ধেও মানুষের উদাসীনতা আসে, কিন্তু সেটা সাধারণত জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসে ভোঁতা নির্ব্বোধ হয়ে যাবার লক্ষণ। সদয়ের ভাই হৃদয়ের যেমন হয়েছে, যোয়ান মদ্দ মানুষটার বেঁচে থাকতেই যেন গা নেই।

সদরে যাবার আগে পটলের পরামর্শে রঘু নীলকণ্ঠের কাছে গেল। গৌরাঙ্গও তার সঙ্গে গেল। এ বাড়ীতে সে কিছুদিন থেকে দুধ যোগান দিচ্ছে, এই সম্পর্কের জোরে ফুড সংগ্রহ সম্পর্কে বাবুর কৃপা দাবী করা হয়তো একটু জোরালো হবে। পটল আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল যে শুধু কাঁদাকাটায় ফল হবে না, একেবারে নগদ টাকা সামনে রেখে বাবুকে ধরে পড়তে হবে। দুটি টাকা নীলকণ্ঠের পায়ের কাছে রেখে কাঁদাকাটার বদলে গম্ভীর উদাস কণ্ঠে রঘু তার নিবেদন জানাল। প্যান প্যান করা তার আসে না। গৌরাঙ্গের কথাগুলি বরং শোনাল ঢের বেশী করুণ। ফুডটা যেভাবে হোক বাবু যদি যোগার করে না দেন তাহলে রঘুর ব্যারামী বৌটা যে মরে যাবে, এইটুকু জানাতে গিয়েই গলাটা ধরে এল তার।

নীলকণ্ঠ বৈঠকখানায় তামাক খেতে খেতে এই সকাল-বেলাই অর্দ্ধেক চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছিল,—টাকার স্বপ্ন। দু'জনের কথা শুনে সজাগ

ও ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'তোর'ও মজেছিস? বলি বাবা, রোগ ব্যারাম কি আগে ছিলনা এদেশে, না, বোতলভরা ফুড না খেয়ে রোগ সারেনি কারো? বাপ ঠাকুর্দ্দা তোদের চোখে দেখেছিল না নাম শুনেছিল ফ্ডের?'

রঘু সাগ্রহে বলল, 'আমিও তো তাই বলি। ডাক্তারবাবু কিনা ফ্ড ফ্ড করে খ্যাপা তাইতে নিরুপায়।'

কাল থেকে রঘুর মনে হচ্ছিল ফ্‌ডটা নিয়ে সে চরম দায়ে ঠেকেছে। ফ্‌ডটা দুর্লভ হওয়ায় তার কেমন ধারণা জন্মে গিয়েছিল, এই বস্তুটি সংগ্রহ করার উপরেই দুর্গার বাঁচন মরণ নির্ভর করছে, ফ্ড খেলে দুর্গা বাঁচবে, নইলে বাঁচবে না। নীলকণ্ঠের কথায় দায়বোধটা একটু হাল্কা হওয়ায় সে স্বস্তি পেল।

'ডাকিস কেন ডাক্তার? ও হল বিলিতী চিকিচ্ছে, বিলেতের লোকের জন্যে। যেমন দেশ, যেমন লোক, তেমনি হবে চিকিচ্ছে, এই হল রীতি। আমরা আর সায়েবরা সমান নাকি? ওরা হল গে ম্লেচ্ছ, বর্ব্বর—দেহসর্ব্বস্ব জাত। একটা লোক প্রেমভক্তির সন্ধান জানে ওদেশে? একটাও না! ওদের চিকিচ্ছে এদেশে খাটবে কেন বাবু? এদেশের ডাক্তারী নেই? আয়ুর্ব্বেদ হয় নি এদেশে? কোবরেজ মশায়কে ডাকতে পারলে না?'

'আজ্ঞে, ভুল হয়ে গেছে। ফ্ডের বদলিতে তালি কি খাওয়াই?'

রঘুর এ প্রশ্নের জবাব নীলকণ্ঠ দিতে পারল না। বোতল ভরা ফ্ডের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ পথ্য আছে ঢের, কিন্তু নীলকণ্ঠ কি মুখস্ত করে বসে আছে তার নামগুলি? কবিরাজকে জিজ্ঞেস করলে জানা

খাবে। শুনে রঘু আবার দমে গেল। দায়বোধটা ভারি হয়ে উঠল আবার।

'তালি ওই এইগোটা যোগার করে দেন বাবু।'

'আমি কোথা যোগার করব ফুড?'

নীলকণ্ঠের মেয়ে সুনীতি ধিনিক ধিনিক নাচের ভঙ্গিতে অকারণেই ঘরে এসেছিল, এবার সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। একটা ফুডের অভাবে একজনের বৌ মরে যাবে শুনে মনটা কেঁদে উঠেছিল বলে নয়, ভেবে চিন্তে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই সে বলে ফেলল, 'আমাদের তো দুটো আছে, একটা দিয়ে দাও না বাবা?'

মেয়েকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে নীলকণ্ঠ বলল, 'ওর একটাও দিতে পারব না বাবু, আমি কি দোকান খুলে বসেছি? বিপদআপদের জন্য রেখেছি ও দুটো, কখন দরকার হয়।'

'আনিয়ে দেবেন বাবু?'

'না-না-না। আমি পারব না।' নীলকণ্ঠ গর্জ্জন করে উঠল। তার রাগ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রঘু আর গৌরাঙ্গ জানল কেন যে তার বাড়ীতেই দু'টো ফুড আছে? এ এক দুর্ঘটনা বৈকি! কপালটাই মন্দ রঘুর। বাড়ীর জিনিষ না দিক, নীলকণ্ঠ দয়া করে একটা ফুড আনিয়ে দেবার ভারটা নিশ্চয় নিত। কিন্তু রাগ হলে মানুষ কি করে দয়া করে?

ভোরে গৌরাঙ্গ নীলকণ্ঠের বাড়ী দুধ দিতে যায়, গাছের মাথা থেকে রোদ মাটিতে নামার আগে। গায়ের জালায় পরদিন সে অনেক বেলা ক'রে গেল আর এমন জল মেশালো দুধে যে জিনিষটা দাঁড়িয়ে গেল দুধ মেশানো জল। সময়মত চা না পেয়ে সকলে ক্ষেপে ছিল, হিসাব মত
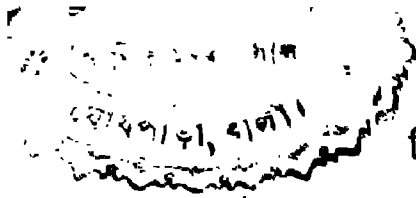
অভ্যর্থনা পেয়ে গৌরাঙ্গ খুসী হল। তার এই প্রথম ত্রুটিকে সবাই উদার ভাবে ক্ষমা করলে সে বড়ই ক্ষুণ্ণ হত!

'এত দেরী করলি যে বজ্জাত?'

'দেরী হয়ে গেব বাবু।'

'এ কি দুধ রে হারামজাদা?'

'মোর দুধ ওমনি বাবু।'

নিজেক বেশ নির্দ্দয় ও নির্ভীক মনে হয় গৌরাঙ্গের, যেটুকু রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তার চেয়ে বিশগুণ রাগ বাবুদের হয়েছে সন্দেহ নেই। যতটা রাগ চাপা যায় চেপে রেখে শুধু যে বাড়তি অসহ্য রাগটুকুতে বাবু আর তার মাগছেলের চোটপাট, একি আর টের পেতে বাকী আছে গৌরাঙ্গের। তাকে ধরে মারতে না পেরে কি কষ্টই হচ্ছে এনাদের! দুধের বেশ টানাটানি পড়েছে চারিদিকে। গোয়ালার গরু কমেছে, গেরস্তের গরু কমেছে, রোগা গরু আরও রোগা হয়ে দুধ দিচ্ছে কম। কিছু কম দামে প্রায় খাঁটি দুধ তার কাছে এতদিন পাওয়া গেছে, তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে মুস্কিলে পড়বার ভরসা এনদের নেই। নীলকণ্ঠের বন্ধু উকিল মধুবাবু চুপি চুপি তাকে সেধে গেছে এখানে যোগান বন্ধ ক'রে তাক দুধ দিতে—দাম সে বেশী দেবে, আগাম দেবে। কিন্তু তখন নীলকণ্ঠকে গৌরাঙ্গ খাতির করত, পোয়াতি একটা মেয়েছেলের প্রাণ বাঁচাতে একটা ফুড না দিয়ে সে তখন তাকে চটায় নি। কাকার সঙ্গে ভিন্ন হয়েই দুধের বদলে নীলকণ্ঠের কাছ থেকে অতি দরকারী কটা টাকা পেয়ে গৌরাঙ্গ কেনা হয়ে গিয়েছিল। কাল পর্যন্ত সে ধারণাও করতে পারে নি এ কৃতজ্ঞতার তার কারণ নেই, বাবুর দরদ সেরেফ ফাঁকি। অভিভাবকের, ভাল মন্দের দায়িকের ঋণ যেন সে শোধ

করেছে কাল পর্য্যন্ত ভোরে উঠে সবার আগে একটুখানি জল মেশানো দুধ পৌঁছে দিয়ে। হুস করে উপে গেছে সে ভাব তার মনের বিরাগে শুধু নীলকণ্ঠের কালকের অপরাধ নয়, এতদিন ধরে তাকে ঠকানোর অপরাধেরও শোধ নিতে পারছে ভেবে হিংসার সুখে মনপ্রাণ তার তাজা হয়ে ওঠে।

অনেক লম্পটের শোষণে ছিবরে বনা বাজারের মেয়েলোকের মত এবাড়ীর গিন্নির চেহারা, গলায় মোটা চেন হারটি সোণার শিকলের মত। এতদিন কিছু মনে হয় নি গৌরাঙ্গের ভদ্রমহিলাকে দেখে মৃদু একটা অস্বস্তি বোধ ছাড়া, আজ বারে বারে তার গরুর কথাটা মনে পড়তে লাগল, যার গলায় হারের মত একটা কুকুরবাঁধা শিকল জড়ানো আছে আজ তিন বছর।

সবার শেষে গিন্নি থামল। গিন্নি থামা পর্য্যন্ত ঠায় বসে রইল গৌরাঙ্গ বারান্দার একপাশে উবু হয়ে। শেষের দিকে একবার তার সাধ হল যে বেয়াদবির পালা সাঙ্গ ক'রে নাকে খত দিয়ে আবেগে গদগদ ভাষায় ক্ষমা চেয়ে জানিয়ে দেয় যে এমন আর হবে না কোনদিন, ফিরে আবার প্রার্থনা জানায় একটা ফুডের জন্য।

কিন্তু সাধ জাগলেও সঙ্কোচের জন্য সেটা গৌরাঙ্গ পেরে ওঠে না। বড় স্পষ্ট হয়ে যাবে তার বজ্জাতির মানে। বড় খাপছাড়া ঠেকবে পরের বৌয়ের জন্য তার এমন ধারা ব্যাকুল হওয়া। হঠাৎ সে যেন দিশে পায়। কেউ যা করে না, মোটেই নিয়ম নয় সংসারে যা করা, সে তো তাই ক'রেছে হাবার মত খেয়ালর বসে অসঙ্গত কাজ—তার যে সাতপুরুষের কেউ নয় সেই একটা রোগা ক্যাংটা মেয়েলোকের মরণ বাঁচন নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে! টের পেলে লোকে হাসবে। তাকে ভাববে ছেলেমানুষ, ছ্যাবলা। সকলে হাসি তামাসা করবে, টিটকারী দেবে।

চিন্তামণি

গোবর্দ্ধনের ছেলে কালীচরণ ছিল তার স্যাঙাৎ। বছর চারেক আগে কালীচরণ কলেরায় মরে যেতে পৃথিবী শূন্য দেখে শোকে একটু বাড়াবাড়ি রকম কাতর হওয়ার ফলাফলটা গৌরাঙ্গের মনে পড়ে যায়। শুধু তাকে ভেংগিয়েই সবাই ক্ষান্ত হয় নি, বড়দের পরামর্শে তাকে ধরে বেঁধে জোর করে মাথা ন্যাড়া করে জল ঢালা হয়েছিল কলসী কলসী, মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল মনসা পাতার রস!

'ও বেলা ভাল দুধ দেব দিদিমণি।'

সুনীতি পালিশ করা চকচকে আওয়াজে বললে, 'আদ্দেক আর আদ্দেক দুধ জল তো। তোমার নামটি কেন গৌরাঙ্গ? ফর্সা ছিলে বুঝি ছেলেবেলা?'

তামাসায় গৌরাঙ্গের প্রাণে আঘাত লাগে। জীবন তার কাছে ভয়ানক ভারি আর গভীর, একটুখানি কুঁড়ে ঘরে বুড়ী মা, কচি বোন আর গাই বাছুরটি নিয়ে সমারোহহীন যে জীবনটুকু সে যাপন করে। বিয়ে করে গাদাখানেক ছেলেপুলে না হলে এ ভাবটা তার কাটবে না, বোধশক্তি ভোঁতা হবে না।

খিড়কি দিয়ে গৌরাঙ্গ এ বাড়ীতে আনাগোনা করে। মেঠো রাস্তায় তার পথ সংক্ষেপ হয় না, কিন্তু মেঠো রাস্তায় চলে তার আরাম হয়। তার ভারি আশ্চর্য্য লাগে যে মানুষের পায়ে পায়ে এমন সরু সুন্দর নির্দ্দিষ্ট পথ কি করে গড়ে ওঠে। কে সকলকে বলে দেয় কোন আধ হাত পরিসরের মধ্যে পা ফেলতে হবে? খেলার মাঠের বুক চিরে নতুন পথের রেখা সৃষ্টি হতে দেখেও সে বুঝতে পারেনি কি করে কি হল। প্রথমে শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন এখানে ওখানে ছড়ানো, পায়ের চাপে শুয়ে পড়া ঘাস, তারপর মরা ঘাসের বিবর্ণতায় অনির্দ্দিষ্ট রেখা ও ধীরে ধীরে সেই রেখার উদলা মাটির পথে পরিণতি।

আরও কি অদ্ভুত ব্যাপার, আবর্জ্জনার পাশ কাটাতে গোড়ার দিকে পথটি যেঁখানে একটু বেঁকেছিল, আবর্জ্জনা নিশ্চিহ্ন হবার পরেও পথের সে বাঁক থেকে গেল—কেউ চেষ্টা করল না সে বাঁকাকে সোজা করতে। মানুষের এসব একর্থকতার প্রমাণ বড়ই দুর্ব্বোধ্য আর রহস্যময় মনে হয় গৌরাঙ্গের। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কথা বেছে বেছে গান রচনা করে সে তার এই অনুভূতিকে রূপ দেবার চেষ্টা করে।

বাঁকা পথে ছাতিমপাড়া যাতি হবে গো
উদাস নগরে পথ দেখাবে কে।
মানুষ চলা পথে যাবার নাগর কি গো সে ॥
আহা হৈ........!
অলো সই !

নীলকণ্ঠের বাড়ীর খিড়কির দরজার পরেই একটা পড়ো চালা, তার ওপাশ থেকে হাঁটা পথ গেছে দুদিকে। এদিকে মাঠ পেরিয়ে পুকুর ঘুরে বড় রাস্তার ধারে সেই শিরীষ গাছের কাছে, যার তলে দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তামণি পটলকে সাইকেল থেকে নামিয়ে তার চিঠি পড়ায়। আর পূবদিকে পথ গেছে ছোট জঙ্গল ভেদ করে তাঁতিপাড়ার গা ঘেঁষে গৌরাঙ্গের বাড়ীর দিকে।

চালার পিছনে চিন্তামণি দাঁড়িয়েছিল। আঁচলের আড়াল থেকে একটা ফুড বার করে সে গৌরাঙ্গের গামছায় জড়িয়ে বেঁধে দিল, ভৎ´সনা করে, বলল, 'তোমার কাণ্ডখানা কি, দুধ মাপতে বেলা কাবার হল ? এটা খাইয়ো তাকে, সেই যার ব্যারাম। কাল যে জন্যে ধাবুর কাছে এইছিলে গো তোমরা, কি জ্বালা !"

চিন্তামণি

'কোথা পেলে ?'

'বাবুর ঘর থেকে সরিয়েছি, কোথা আবার পাব ? জানাজানি হয় নি যেন বাবা, দূর করে খেদিয়ে দেবে মোকে। বৌটা কেমন আছে ?'

'বাঁচে কি না বাঁচে।'

আপশোষের একটা আওয়াজ করে চিন্তামণি মুখখানা করুণ করতে চায়। গৌরাঙ্গের মনে পাক খেতে থাকে জিজ্ঞাসা যে চিন্তামণির কাজের মানে কি।

চিন্তামণির মনে দরদ আছে নিশ্চয়। অজানা অচেনা পরের বৌয়ের জন্য নইলে কে সাধ করে চুরি করতে যায় ? অথচ মুখ দেখে আর গায়ে পড়ে কথা বলতে শুনে মনে হয় সে যেন ভারি চালাক মেয়েমানুষ, প্যাঁচ আছে তার মধ্যে।

তাকে আরেকটু চিনবার ইচ্ছায় গৌর শুধোয় : 'তুমার ঘর কুথা গো ?'

শুনে চিন্তামণি মুচকে হাসে।—'ওটা পৌছে দাওগে যাও। আলাপ কোরো'খন পরে যখন সময় পাবে।'

বলেই দমক মেরে পিছন ফিরে সে হাঁটতে স্থুরু করে দেয় তাড়াতাড়ি ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গিতে। অনেকদিন থেকে সে জানে এমনি করে হাঁটার সময় কোমরের নীচে দেহের গাঁথুনি তার মানুষের নজর টেনে নেয়। কোনদিন তার কোমর দুলিয়ে হাঁটা দেখার কপাল যদি নাই হয়ে থাকে এ ছোঁড়ার, আজকে দেখুক। বাবুর মেয়ে নাচে,—কি ছাই সে নাচ ! সাপের মত হাত দুলিয়ে এপাশ ওপাশ করে হাঁটু পেতে বসে আর উঠে দাঁড়িয়ে যদি নাচ হত ওই রোগা প্যাঁটকা শরীর নিয়ে, মানুষ তবে কাঠিকে শাড়ী পরিয়ে খুসীমত নাচাত, মেয়েমানুষ চাইত না। মেয়ে নাকি আবার প্রাইজ পেয়েছে

নাচ দেখিয়ে! গৌর যদি কোনদিন দেখে থাকে তার দেশের ওই মেয়ের নাঁচ, আজ বিদেশিণী তার শুধু চলনটা দেখুক। বুঝুক, ভগবান যাকে জ্ঞান তার চলার মধ্যেও কত পরাণ আকুল করা নাচ। খানিক গিয়ে চিন্তামণি মুখ ফিরিয়ে তাকায় তার ঈষৎ হাসির চটুল ভাষা নিয়ে আর গৌরাঙ্গেব মুখে সেরকম জবাবী হাসির বদলে সরল সহজ বিহ্বলতা দেখে একটু অবাক হয়ে বাড়ী ঢোকে। মানুষ যে কাঁচা থাকে, নিজে যে সে একদিন কাঁচা ছিল, কতকাল মনে পড়েনি চিন্তামণির! নীলকণ্ঠ আর পটলের বয়স পেতে অনেক দেরী গৌরাঙ্গের, আজ তক্ হয় তো সে কোন মেয়েছেলের গলা পর্য্যন্ত জড়িয়ে ধরেনি একটিবারের জন্য। মৃদু একটা ব্যাকুলতা মনে আসে চিন্তামণির, বিয়ের আগে গৌরের বয়সী সেই যে একজন তাকে তীব্র যন্ত্রনা দিয়েছিল মৃদু বেদনার সঙ্গে তার কথা মনে পড়ে এতকাল পরে। আর সেই সঙ্গে সস্তা মনে হয় নিজেকে, ফাঁকা মনে হয়, ফুরিয়ে যাওয়া চিকন গুড়ের চ্যাটালো হাঁড়ির মত।

সেদিন বিকালে দুর্গা মারা গেল। আকাশ ফুঁড়ে ফুডটা পাওয়া গেল, বার চারেক ক্ষীরের মত ঘন করে অনেকখানি ফুড খাইয়ে দেওয়া হল, তবু যে সে বাঁচল না তাতে কারো সন্দেহ রইল না স্বয়ং ভগবান তাকে মেরেছেন। খবর শুনে গৌর ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে দেখল, ফুডটা যোগার করে ছোট-বৌকে যে খাওয়ানো হয়েছে এই সান্ত্বনায় রথু নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে।

'ডাক্তর যা বলেছে সব করিছি। করিনি? অ গৌর, করিনি?' এই বলে কপালটা দু'বার চাপড়ে দিয়ে পাঁচুর হাত থেকে কলকেটা নিয়ে তিনবার সাঁ সাঁ শব্দে জোরে জোরে টেনে সে কাসতে থাকে।

চিন্তামণি

দুদিন ধরে দুর্গার জন্য তার দুর্ভাবনার বাড়াবাড়িতে গৌরের বড় ভয় হয়েছিল। বৌটার ভালমন্দ কিছু হলে রঘু সে আঘাত সহজে সাম্‌লাতে পারবে না, হয়তো ভেঙ্গে পড়বে অনেকদিনের জন্য, যতদিন না ভগবান শোকটা সইয়ে দেন। ভাবতেও কত যে আলোড়ন উঠে মনটা মোচড় খেয়েছে গৌরের! মানুষের মন যে কি অবাক জিনিষ ভেবে সে প্রায় রোমাঞ্চ অনুভব করেছে অনেকবার। মনের তলে ছোটবৌয়ের জন্য, দুর্গার জন্য, রঘু যে এমন পাগল এতগুলি বছর রঘুর সঙ্গে মিশেও কে তা ভাবতে পেরেছিল? রঘুর সুখদুঃখ চিরদিন তার মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে বলেই না গৌরের বুকেও সহানুভূতির বান ডেকেছিল দুর্গার জন্য। অথচ কি সহজ আর স্বাভাবিক শোক হয়েছে ছাখো রঘুর! তার গত দুদিনের উদ্ভট ব্যবহার বাদ দিলে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনি।

শোকে উন্মত্ত-প্রায় রঘুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে শোকার্ত্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে সাধারণ চলনসই দুঃখ বোধ করতে গৌর খানিকক্ষণ নারাজ হয়ে থাকে। গরুটা পর্য্যন্ত দুয়ে রেখে আসে নি ভেবে তার একটু রাগও হয়। ছেলেমানুষী করে করেই সে ঠকছে চিরকাল। দুধটা চট্ করে বাবুর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আর দেখা হলে চিন্তামণিকে দুর্গার মরণের খপরটা জানিয়ে এখানে এসে অনায়াসেই সে আটকা পড়তে পারত। কি এসে যেত আধঘণ্টা একঘণ্টা দেরীতে, দুর্গা যখন মরেই গেছে আর রঘু যখন দিশেহারা হয়ে যায় নি সেই মরণে।

ঘরে কাঁপা কাঁপা সুরে মেয়েরা গান করে যায় মড়াকান্নার, পাড়ার আত্মীয় বন্ধু বাঁশ কেটে আনে মাচা বাঁধার জন্য। রঘু এদিক গিয়ে ওদিক গিয়ে ধীর শান্তভাবে ছটফট করে বেড়ায়, কখনো একটু দাঁড়ায় অথবা

উবু হয়ে বসে, খানিক শূন্যে তাকিয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে আর দু'এক মুহূর্ত্তের জন্য চামড়া কুঁচকে-কাঁচকে মুখখানা তার বিকৃত হয়ে যায়। হুঁকো কলকে অনেকের হাতে হাতে ঘুরছে। রঘু মাঝে মাঝে তামাক টানে আর কাসে। সাঁসাঁ করে বে-কায়দায় টানে বলেই কাসে, নইলে এমন কড়া তামাক ভূভারতে নেই যে রঘুকে কাসাবে, চিটায় মিঠা দা-কাটা তামাকের তো কথাই নেই।

'ধর, গৌর।'

গলাটা ভারি রঘুর। ভিজে ঢাকের মত ভারি!

এইসব মিলেমিশে কখন যে গৌরের হৃদয়ে যথোচিত বেদনা এনে দেয়! সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে তার হৃদয়ের সেই বেদনাবোধে কি সব কারণে কয়েকবার খিচ ধরে ধরে তার কান্না পায়। দুঃখ তার বৈরাগ্য হয়ে দু'চোখ দিয়ে গলে গলে পড়তে থাকে টস টস করে। জীবন যৌবন ঘরদুয়ার গরুবাছুর ক্ষেতের ফসল সব মিছে, এ জগতে কেউ কারো নয়। বৌ কিসের, মেয়েমানুষ কি? সব মায়া, সব ফাঁকি!

'দুধ লিত্তে এইছে দাদা।'

গৌরের কচি বোন আন্না তাকে ডাকতে এসেছে। খানিক মূঢ়ের মত বসে থেকে গৌর নীরবে উঠে দাঁড়াল।

'যাস নি গৌর। অ গৌর, যাস নি মাইরি।'

'এখুনি এসবো'খন—এক দণ্ডে।'

রঘুর সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে গৌর বেরিয়ে যায়। রঘুর জন্য তার আর চিন্তা ছিল না। ওর কিছু হবে না।

দুধ নিতে এসেছিল চিন্তামণি। তাকে দেখে গৌরের একবার মনেও হল না যে নীলকণ্ঠের চাকর বাকর কুলি মজুর থাকতে

চিন্তামণি কেন দুধ নিতে এসেছে। মনটা তার এতখানি বিগড়ে গিয়েছিল।

ছেলেকে দেখেই গৌরের মা ব্যগ্রকণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'বার করেছে? নিয়ে গেছে?'

গৌর বলল, 'না।'

রঘুর বাড়ী গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে হাহুতাশ করার জন্য গৌরের মা উতলা হয়ে ছিল, ছেলের জবাবটা শোনামাত্র সে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

'ফের যাস্ তো ঘরে কুলুপ দিয়ে যাস্।'

ঘরে একটা কুলুপ আছে, তাতে চাবি ঘোরে না। কুলুপ দেবার উপায় থাকলে গৌরের মা কি আর এতক্ষণ ঘর আগলে বসে থাকে।

চিন্তামণির সাবান-কাচা সাদা কাপড় একাদশীর চাঁদের আলোর রঙ ফিরিয়ে দিয়েছে গৌরের একরত্তি উঠোনে। তার পায়ের কাছে পেঁপে গাছের ছায়ার ডগাটাকেও ঝাঁকড়া-চুলো দৈত্যের মাথা বলে কল্পনা করা যায়। মানুষ-মরা সন্ধ্যার আলো ছায়া দিয়ে পৌরাণিক রহস্য চারিদিকে ঘনিয়ে আনা পুরাণ-ঘেষা কল্পনারই কাজ।

'বৌ বুঝি হোথা?'

'বৌ? কার বৌ?'

'ওমা! বৌ নেই?' আঁচলের তল থেকে হাত বার করে গালে দিয়ে চিন্তামণি অবাক হয়ে যায়।—'পালাই বাবা তবে।'

'দুধ লিয়ে যাও।'

গৌরাঙ্গ বিরক্ত হয়েছে বুঝে চিন্তামণির একটু রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি তার ভাল লাগে না। প্রথমে সে ভেবেছিল রঘুর বৌ গৌরের বোন টোন কেউ হবে, তারপর পটলের কাছে শুনেছে সে ওর

কেউ নয়। ওর জন্যে মানুষ কি মরতে পাবে না সংসারে? গাঁয়ের কেউ মরলেই যদি এমনি ধারা করতে হয়, টেঁকাই যে ভার হবে মানুষের।

দুধের পাত্র হাতে নিয়ে চিন্তামণি নালিশের সুরে বলল, 'একলাটি কি করে যাব ভাবছি।'

'কি করে এলে?'

'এখন এইছি? সন্দে না লাগতে এসে ঠায় বসে রইছি তোমার জন্যে।'

বাছুর ছেড়ে দিয়ে গৌর চিন্তামণির অনেকখানি তফাৎ দিয়ে গিয়ে দাওয়ায় উঠল। সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাধ জাগলেও কেমন যেন সাহস হল না। চিন্তামণি একটু পিছিয়ে গেলে সে মরমে মরে যাবে। তার ফাঁকা 'বাড়ীর উঠোনে তাকে সামনে দাঁড়াতে দেখে চিন্তামণি পিছিয়ে গেলে তার যে লজ্জা আর অপমান হবে তার বড়ো লজ্জা আর অপমান জীবনে যেন তার জোটে নি, জুটবে বলেও মনে হ'ল না।

'সড়ক ধরে যাওগে না, যদি ইদিক পানে ডর লাগে? রাত আর হয়েছে কত, সড়কে লোক চলছে, সাথী পাবেখন।'

'ডর তো সেখানে গো, কেমন সাথী জুটবে তা কি জানি? তোমাদের দেশের মানুষ কেমন তোমরাই জানো ভালো, আমি হলাম ভিন্ দেশের লোক।'

একাই ফিরবে ভেবেছিল চিন্তামণি, আগে ভয় তার ছিল কম। ভয়ের কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এতক্ষণে ভয়টা তার সত্যই বেড়ে গেল। এদিকে মেঠো পথের নির্জনতা আর ওদিকে বাঁধা সড়কের বিদেশী অজানা পুরুষের কথা ভেবে গা তার ছমছম করতে লাগল। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে এল দাওয়ার কাছে। মিনতি জানিয়ে

বলল যে গৌর তাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক ! ঘরে কুলুপ না দিলে কিছু হবে না, কতক্ষণ আর লাগবে তাকে এগিয়ে দিয়ে গৌরের ফিরে আসতে ? এসেই বোকামি করেছে চিন্তামণি—ঘাট সে মানছে গৌরের কাছে।

'শোন বলি কেন এলাম।'

বিদেশ বিভূঁয়ে একা পড়ে গিয়ে কি যে কষ্ট চিন্তামণির ! এসে থেকে সে সমান একটা মানুষ পায়নি, চাষী গেরস্থ ঘরের মানুষ, এক ধাঁচের মানুষ, যে মন খুলে দুটো কথা কয়ে বাঁচবে। বাবুর বাড়ী মানুষ আছে ঢের কিন্তু সবাই তারা ভিন্ন জাতের, আলাপ করে সুখ নেই। ঝি আর মজুর মাগীদের সাথে কি তার বনে, সে ছিল চিরটা কাল ঘরের মেয়ে, ঘরের বৌ আর ঘরের রাঁড়ী ? ওই যে কথায় বলে জলের মাছের ডাঙ্গায় ওঠা, সেই দশা হয়েছে চিন্তামণির। তাই না সে এসেছিল দুধ নেবার ছুতোয় গৌরাঙ্গের মা বোন মাগের সাথে দু'দণ্ড কথা কইতে।

'পৌঁছে দেবে না মোকে ?

'দেব না বলিছি ?'

মেঠো পথে সাপের ভয়। চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে গৌর সড়কের দিকে এগিয়ে গেল। অপরিচয়ের সব ব্যবধান তাদের তখন ঘুচে গেছে। বাবুর বাড়ীর দাসী বলে চিন্তামণিকে একটু পর মনে হয়েছিল গৌরাঙ্গের, কি ভাবে তাকে নিতে হবে ঠিক ঠাহর করতে পারে নি। ওরা কোন জাতের মেয়েমানুষ আর কেমন ওদের হালচাল তা কে জানে ! নইলে চিন্তামণির সঙ্গে কথা কইতে কি গৌরাঙ্গের ভাবতে হত, না কোন ব্যবহার উচিত হবে ঠাহর করতে তার ফাঁপর লাগত এতক্ষণ ? চাষীর মেয়ের মন না জানুক, মনের গড়ন চাষী জানে। মেয়েপুরুষ নির্ব্বিশেষে

বুলিও চাষীদের এক,—কথার ও ভাষার মানের গণ্ডী সম। এইটুকু পথ যেতে যেতে তাই দু'জনের ব্যগ্রতাহীন অনায়াস কথোপকথনে অনেক কথার আদান প্রদান হয়ে গেল—পরস্পরের নানা বৃত্তান্ত। সুরেন মিল রাইস মিলের সামনে যখন তারা পৌঁছল, চিন্তামণি তার চোখের কথা বলছে। গত বছর চোখের অসুখ হয়েছিল বলে ক'দিন থেকে মাঝে মাঝে বাঁ চোখটা একটু কট কট করায় ভাবনা হয়েছে চিন্তামণির।

'চোখে কম ত্থাখো ?'

'না গো, কম কেন দেখব ? দুকুরবেলা চোখটা কেমন টাটায়। যা ধুলো বাবা তোমাদের দেশে !'

আজ সকালেও তার দেশ সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ মন্তব্য গৌরের পছন্দ হত না, হয়তো কলহের সুরে পাল্টা জবাব দিয়ে বলত যে তোমার দেশে ধুলো নেই ? এখন কথাটায় সায় দিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'পদ্মমধু দিও দিকিন চোখে একটু। ও বড় ভাল ওষুধ।'

সেখান থেকে মেঠো পথেই গৌর সোজা রঘুর বাড়ী গিয়ে হাজির হল। মাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে হৈ চৈ করে দুর্গাকে পোড়াতে গেল বালিময় শুকনো নদীর বুকে। কানাই বংশী আর হরিধনের জন্য একটা দেশী মদের বোতল রঘুকে কিনতে হয়েছিল, গৌরও একটু চেখে দেখল। ভাল করে গেঁজে ওঠে নি এরকম অল্প নেশালো তাড়ি সে দু'এক ঢোঁক খেয়েছে মাঝে মধ্যে, মদ কোনদিন ছোঁয়নি।

চিন্তামণি

খেদির পাড়া
২৪ পরগণা
৪ঠা ফাগুণ

বৈন চিন্তামণি তোমায় কি লিখিব আমার লিখিবার মুখ ন'ই। আমি কেন জীবন্ত আছি আমার মরণ হয় না ভগমানকে দিবারাত্র জানাইতেছি। কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তুমি কাঁদাকাটা করিবা বলিয়া জানাইতে বিলম্ব করিলাম। ইহার পর আর বাঁচিব'র সাধ ন ই কিন্তু পোড়া কপালে মরণ নাই আমি কেন মরিব একচক্ষু ভগবান আমাকে কেন লইবে। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে জানিবা। ইহার সব বিত্তান্ত ভাবিলে আমার মাথা ঘুরায় আমি দিবারাত্র মরণ কামনা করি। কাকী থাকিতে দিবে না বলিয়াছে লিখিয়াছিল ইহাতে কেমন করিয়া জানিব কাকী চাঁপাবালাকে মেয়া শুদ্ধ খেদাইয়া দিয়াছে যে তাগো খাওয়া জুটে না হৈমী এবং তাহার মাকে কেমন করিয়া রাখিবে। ইহা কথার কথা ভাবিয়াছি তাই টাকা পাঠাই নাই। আমি কেমন করিয়া জানিব টাকাই বা কোথায় পাইব। গলায় দড়ি দিবে জানাইলে চুরি ডাকাতি করিয়া পাঠাইতাম কিন্তু হতভাগী ইহা জানাইল না। নবিন টাকা পাঠায় নাই। তাহার দোষ কি নূনা জলে ধানের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে কাজ করিয়া টাকা পায় নাই এবং তাহার কি দুর্দ্দশা সে কলে কুলির কাজ করিতে গিয়াছে। চাঁপাবালা কয়দিন খাইতে পায় নাই হেমীকে লইয়া কোথায় পড়িয়া থাকিয়াছে এজন্য আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছে। গজেন মুক্তারের বাড়ীতে উঠিয়া গলায় দড়ি দিয়াছে তাহা হৈমীর জন্য। গজেন মুক্তারের মুহুরির সাথে হৈমী কোথায় চলিয়া গিয়াছে এই কলঙ্কে বুক ফাটিয়া চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে। সব গজেন মুক্তারের

কারসাজি বলিয়া শুনিতেছি জানিবা। বিন্দী পাড়ার বিপিন হৈমীর জামায়ের বড় ভাই সে গিয়া শুনিয়া আসিয়া বলিয়াছে। সব লোকে আমার মুখে থু থু দিতেছে আমি কেন জীবন্ত আছি। গজেন মুক্তার টাকার কুমীর হইয়া এমন কাজ করিল। মুহুরিকে দিয়া হৈমীকে পলাইয়া লইয়া গেল। গজেন মুক্তার থানায় গিয়া মুহুরির নামে থানা পুলিশ করিয়াছে। বিপিন বলিল ইহা তাহার কারসাজি বজ্জাতি করিয়া করিয়াছে যে লোকে বলিবে যে নির্দ্দুষী। মুহুরিকে তুমি চিনবা সে চাঁপাবালার পিসাতো ভাসুরের ছেলে শরৎ। চাঁপাবালা শ্বশুরবাড়ী থাকিবার কালে হৈমীর কালে আসিয়া হৈমীকে কত আদর করিত। কাকী তাড়াইয়া দিলে সেই নাকি চাঁপাকে গজেন মুক্তারের বাড়ী ঠাঁই দিয়াছিল। শরৎ এমন ভালোমানুষ আর অল্পবয়সে তাহার কেন এমন সাহস হইবে। আমি এই হুঁশে আছি আমার মরণ নাই। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিল হৈমী কলঙ্ক করিল আমি কি করিব। শুধু বুক চাপড়াইয়া মরিব। আমার খাওয়া জোটেনা। কয়টা টাকা পাঠাইতে লিখিলাম তুমি পাঠাইলে না। কয়মাস বেতন পাইয়াছ তথাপি ইহা কিরূপ। তোমাকে কতকাল খাওয়াইয়াছি ভুলিয়া গিয়াছ : তুমি মধুবনী গিয়া সুখে আছ আমি না খাইয়া মরিব। পত্রপাঠ কয়টা টাকা পাঠাইবা।

'দিদি'

তিন

চোখ মেলে চাইলেই শরৎকালের শোভা নজরে পড়ে, সে শোভার রঙ ভারি সবুজ। লাল ধূলোর কথা তুলে গৌরের এদেশকে নিন্দে করার ছুতো চিন্তামণির বর্ষায় ভেসে গিয়েছিল, এখন যদি বা এখানে ওখানে শুকনো কাদার ডেলা গুঁড়িয়ে ধূলো উড়ছে দু'এক ঝলক, সেটা কিছু নয়। কুয়াশার দিনগুলি পেরিয়ে গিয়ে আবার ভালো করে ধূলো উড়তে সুরু হবে, ফাগুনের দখিনায় হবে তার ওড়নের চরম বড়াই।

মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর থেকে অলস অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করতে করতে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে। ধান কাটার সময় এলো এই যা ভরসা। শীষের প্রৌঢ়তা প্রাপ্তির দিন থেকে সবাই নজর পেতে আছে ধানে রঙ ধরবে কবে। খাটুনি আসবে কঠিন, ঝর ঝর ঘাম ঝরবে, গায়ে হাতে ব্যাথা হবে, কোমর বাঁকা হয়ে যাবে তাদের বয়স যাদের একটু বেশী হয়েছে। কাজে সুখ নেই, বড় কষ্ট কাজে। নতুন আলু, সোনালী আখ, শাকশব্জী, বুট মটর সব কিছু কাটা তোলা ধোয়া চাঁছা বয়ে নেওয়া যোগান দেওয়ার কাজে। কাজ সুরু করার খানিক পরেই মনে হবে কি যেন নেই শরীরে,—একটুখানি ছিল কিন্তু ফুরিয়ে গেছে। তারপর থেকে বাকী দিনের কাজ শুধু সহ্য করার ধৈর্য্য দিয়ে, বাঁধা গতিতে বাঁধা নিয়মে কলের মত। গৌর যে এমন ব্রহ্মচারী যুবক, খেটে যাতে সুখ মেলে তা তারও যেন শরীর মনে মোটে ছটাকখানেক আছে। *অকেজো দিনগুলির* চাপে কাতর হয়ে পড়ে বলেই তারা কাজের কষ্ট চায়। বছরে কতকাল যে চাষীর বেকার কাটাতে হয়!

চিন্তামণি

সবাই নয়। নিজের ও ছেলেমেয়ে মাবোনের সরু হাড় আর অলম্ব মাংসপেশী কোনমতে যারা টিকিয়ে রাখতে পারে তারা অন্য কাজ খোঁজে না। মজুর হতে খাঁটি চাষী মরমে মরে যায়। ভূমিহীন চাষী পর্য্যন্ত। পরের জমিতে মজুরগিরিই সে করে, তবু চাষ আবাদ ছাড়া আর কিছু করে না সে চাষী।

সদয়, পচা, ছোলেমান, মৈনুদ্দিন কয়েক টুকরো জমি চষে বটে কিন্তু তাঁতও বোনে বলে তারা তাঁতি। আকবর, যদু, নাসের, সুখলাল ফসল বোনা আর ফসল তোলার সময় ছাড়া বাড়ী থাকে না, কয়লা তুলতে যায় ঝরিয়ার খনিতে, ওরা তাই কুলি। গাঁওতলীতে ঘরের লাগাও সাত কাঠা জমি আছে জগুর, তাতে জগু বরাবর লাঙল দিয়ে ফসল ফলিয়ে আসছে নিজে, কিন্তু মুচীকে কে চাষী বলবে সেজন্য, সরোজ বাঁড়ুয্যে মুদীখানা খুলেও যখন মুদী নন।

সরোজ বাঁড়ুয্যের দোকানের সামনে রাস্তার ধারে জগু জুতো সেলাই করতে বসে, প্রায় আপিস টাইম থেকে সন্ধ্যাতক। থানা আদালত জেলখানার ফাঁকা আর সাফসুরৎ এলাকা থেকে মধুবনীর অভিজাততম পথটি আভিজাত্য হারাতে হারাতে গোটা কয়েক মোড় ঘুরে এইখানে বাঁক নিয়ে বাজারের ঘিঞ্জি অঞ্চলে ঢুকেছে, নোংরা আর সঙ্কীর্ণ হয়ে। বাঁকেরই আন্তরিক কোণটার ওপর বাঁড়ুয্যের মুদীখানা—দোকানও বড়, বিক্রীও খুব। জগুর রোজগারও মন্দ হয় না, মাসে অন্ততঃ পাঁচ সাতদিন শ' টাকা পূরে যায়। গড়পড়তা তিনদিনে একদিন জগু দু'নম্বর দেশী গিলে বাড়ী ফেরে—সন্ধ্যা পার করে রওনা হয়। অন্যদিন দিনের আলো খানিকটা বজায় থাকতেই উঠে পড়ে। বড় পথটা ধরেই তাকে আসা যাওয়া করতে হয়—থানা আদালত আর জেলখানার সরকারী পাড়া

পেরিয়ে। জেলটা তার চেনা, ভেতরে দু'দফায় কিছুকাল বাস করেছে।

বাজার আর আদালতের মাঝে পথের দু'ধারে বাড়ীগুলি বেশীর ভাগ ভাঙ্গাচোরা ইট বার করা সেকেলে ধাঁচের পুরাণো অথবা বদরঙা সেকেলে ধাঁচের নতুন। কয়েকটি বাড়ীর চেহারা শুধু খানিক আধুনিক। সকালে ও বিকালে এসব বাড়ীর কোন কোনটা থেকে ডাক আসে :

"এই মুচী! মুচী!"

সকালে আসবার সময় জগু ডাক শোনে, দরে বনলে জুতো সারায়। বিকালে হাজার গলা ফাটানো ডাক শুনে সে ফিরেও তাকায় না।

মরা খিদেয় আর শ্রান্তিতে মন তখন তার উদাস হয়ে আছে।

পূজা উপলক্ষে পটল এক জোড়া জুতো কিনেছিল। দু'দিন পায়ে দিতেই জুতোর একটা পেরেক ডান পায়ে বিঁধতে লাগল। জুতোটা হাতে নিয়ে সে দ্যাখে, খানিকটা সোল কি করে যেন কোথায় খসে পড়ে গেছে। সস্তায় জুতো কেনার প্রায়শ্চিত্ত যে দু'দিনের মধ্যে সুরু হয় পটলের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। জুতোটা সারাতে দিয়ে বাঁড়ুয্যের দোকানের ময়লা বেঞ্চে বসে খানিকক্ষণ সে একটানা সেই জুয়াচোরদের গাল দিতে লাগল, মানুষকে যারা নতুন বলে পুরাণো খারাপ জুতো দিয়ে ঠকায়। তার সমালোচনার মোট কথার মানে হল, ওরা ছাড়া পৃথিবীতে আর বুঝি জুয়াচোর নেই।

জগু তার কামানো চিবুক নামিয়ে ঝাঁটার মত আছাটা মোটা গোঁফের নীচে হাসি ফোটায়, উল্‌ল্‌ ল্‌....। বলে, 'ফরমাস দিয়ে জুতো বানান, সাতটি বছর ছুঁতে হবে না জুতো।'

'তুই বানাবি?'

'লয় কেনে? বানাই নি কো ফরমাসি জুতো? ঠাকুরমশায় জানে -কুকুরে যদি না লিয়ে যেতো—'

দু' আড়াই বছরের কথা, জুতোর শোকটা সরোজ বাড়ুয্যের কেটে গেছে, মুখে তাই তার কথাটা স্মরণ করে হাসি ফুটতে পায়। শক্ত লোহার মত একজোড়া জুতো তাকে জগু বানিয়ে দিয়েছিল, কয়েক মিনিট পরবার পরেই বাঁড়ুয্যের পায়ে আর ফোস্কা পড়ার স্থান থাকে নি। জুতো জোড়া খুলে রাখা হয়েছিল চৌকীর নীচে। প্রথম দিনটা পরিস্কার বোঝা যায় নি, পরের দিন টের পাওয়া গিয়েছিলো যে ঘরে বেশ একটু গন্ধ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে তিন চার দিনে ঘর ম ম করতে লাগল সেই জুতোর গন্ধে। বাইরে বার করে রাখা মাত্র রাস্তার এক নেড়ে কুত্তা এসে একপাটি মুখে করে পালিয়ে গেল।

'যদি না নিয়ে যেত—'

'কাঁচা ছাগলের চামড়া দিয়ে ব্যাটা জুতো বানিয়েছিল। না যায় পায়ে দেয়া, না যায় গন্ধের চোটে ঘরে টেঁকা। মুচির কাছে জুতো কিনো না, খপর্দ্দার!'

জগু নিজেই কথাটায় সায় দিয়ে বলল, 'মুই মুচি লই। জাত মুচি লই।'

পটল বলল, 'ছাগলের চামড়া? গরুর চামড়া বলুন।'

বাড়ুয্যে বলল, 'গরুর চামড়া? খেপেছ! গরুর চামড়ার জুতো পরব আমি!'

চামড়ার মধ্যেও সে যেন টের পায় কোনটা গরু কোনটা ছাগল! সবার বুদ্ধি ভোতা তাই রক্ষা, নইলে হয়ত কেউ জিজ্ঞেস করে বসত: গরুর চামড়া আর ছাগলের চামড়ার জুতোর তফাৎ জানবেন কি করে?

চিন্তামণি

এমনি সময় গৌর আর রহিমকে আসতে দেখা গেল কোর্টের দিক থেকে। গৌরের হাতে একটি দলিল।

গৌরের মুখে বজ্জাতি মুচকি হাসি। দেখলেই সন্দেহ হয় কোন একটা দাঁও মেরেছে। গরীব চাষীমজুরের মুখে এই দাঁও-মারা হাসি ভাষার চেয়ে প্রাঞ্জল। দেখেই কাঁচ্চা খানেক একঝলক বাড়তি রক্ত পটলের বুকে উঠে গিয়েছিল। চিন্তামণির জন্য তার মাথা ব্যাথা নেই। তবু চিন্তামণি তো মেয়েমানুষ আর বেদখলী মাল। গৌরের সঙ্গে কিছুদিন থেকে চেনা হয়েছে চিন্তামণির। গৌর কি তবে চিন্তামণির— ?

'আহ্লির ভাঙ্গা জমি পেলাম খানিক পটোলবাবু।'

'কিনলি নাকি ?'

পটল যে বেঞ্চে বসেছিল পটলের সম্মান বজায় থাকে এতখানি তফাতে সেই বেঞ্চেই জাঁকিয়ে বসে গৌর বলল, 'কিনতি যাব কেনে ? ভাগ পেলাম। চাঁদকাকা কিনেছে জমি, আমি ভাগ পেলাম—ফসল শুদ্ধু। কাকা দাপড়াবে, কাটা ছাগলের মত দাপড়াবে।'

রহিমকে সে খাতির করে বিড়ি এগিয়ে দেয়। জিভ দিয়ে গোড়ার দাঁতের ফাঁক থেকে শাকের কণা খসিয়ে এনে উত্তেজনায় সামনের দাঁত দিয়ে কুট্ কুট্ কাটতে থাকে। রহিমের কাছ থেকে তার চাঁদকাকা আহ্লির ভাঙ্গা জমি কিনেছে,—তারা ভিন্ন হবার আগে। গৌর তা জানত না। এবার মাঠে প্রথম লাঙ্গল দেবার সময়ে খবরটা শুনে মনটা তার গিয়েছিল বিগড়ে, জমি জায়গা কিনবে বলে চাঁদকাকা তবে তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে, তাকে ঠকিয়েছে ! তলে তলে সংসার থেকে সরিয়ে টাকা জমিয়েছে কাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়ে নিজে একদিন এইসব

করবে বলে! পরন্ত তবু কাঁটাটা খচখচ করেছে গৌরের মনে। পরন্ত আহুলিতে রহিমের সঙ্গে তার দেখা। নেহাৎ বিপাকে পড়ে রহিম তার জমিটুকু বেচে দিয়েছিল, আজ সেই জমিভরা জমকালো ফসল দেখে তার মনটা আঁকুপাঁকু করছে, গাটা জ্বালা করছে, চোখে জল আসছে। তার হাতে কোনবার তো এমন ফসল হয়নি। বেইমান মাটি!

রহিম। বিশ রুপিয়ায় দু'আনা ফসল দিবে না? না দিলে। খোদা আছেন। না—দিলে!

গৌর। আমায় বলছ?

রহিম। সরম নাই, আঁ? জমিটা দিয়ে দিলাম তোমাদের আধা দামে, পয়লা বছরের দু'আনা ফসল বিশ রুপিয়ায় দিবে না! বহুত আচ্ছা। দেখে লিব।

আহুলিতে চাঁদকাকা কার জমি কিনেছে কিছুই গৌরের জানা ছিল না। রহিমের সঙ্গে খানিক আলাপ করেই জানা গেল কাঁকাটা তার কত বড় ঠক্! ভিন্ন হবার আগে জমি কিনেছে তার কাকা, তাকে ভাগ দেয়নি!

চাঁদকাকার নামে গৌর তাই নালিশ ঠুকে দিয়েছে। নিজের ভাগটা পেলেই সে রহিমকে মাগনা দু'আনা ফসল দেবে।

সরোজ বাঁড়ুয্যের হাসির শব্দে গৌর চমকে গেল। বাঁড়ুয্যে হাসে খুব কম, যখন হাসে হাসিটা তার বাজীর বোমার মত দমাস করে ফেটে চীনা পটকার মত পটাস পটাস ফেটে চলে। দেহের অনুপাতে গলার নালিটা তার একটু সরু।

'গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল!'

'আজ্ঞে না মুক্তারবাবু বললে—'

বাঁড়ুয্যের হটাৎ ফাটা হাসি আচমকাই থেমে যায়। ধমকের সুরে

সে বলল, 'মোক্তারবাবুরা অমন বলে ! আরে মুখ্যু, তোর কাকীর নামে যদি জমি কিনে থাকে ? যদি বলে ভিন্ন হবার পর কিনেছে ? যদি বলে সম্পত্তি সব তার, তোকে শুধু মানুষ করেছে খাইয়ে পরিয়ে ?'

মুখখানা শুকনো করে গৌর দলিলের নকল দেখায়—তাকে ভিন্ন করার প্রায় আড়াই মাস আগে চাঁদকাকা নিজের নামে জমি কিনেছে। রহিম আদালতে হলপ করে বলবে যে জমি কেনার সময় গৌর আর চাঁদ একবাড়িতে একান্নে ছিল। গৌরের বাপ এ বাড়িতে বাস করেছে স্বর্গে যাওয়া পর্য্যন্ত, চাঁদ কি করে বলবে যে দয়া করে আশ্রয় দিয়ে তাকে মানুষ করেছে ? নাঃ, কোন দিকে ফাঁক নেই। সনৎ মোক্তার তাকে সব পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছে।

এবার পটলের সঙ্গে চোখ চাওয়া চাওয়ি করে বাঁড়ুয্যে মুচকে হাসল। রহিমের ঠোঁটের কোণেও যেন হাসি দেখা গেল একটু।

'তোমার কাকা কি বলে গৌর ?' পটল জিজ্ঞেস করল।

'কাকার কাছে যাইনি।' গৌর দু'বার ঢোক গিলল, 'যেমন ঠকিয়েছে আমায় তেমনি জব্দ হোক।'

'ও, ঝাল ঝাড়ছ ?' পটল বলল। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছে।

'জব্দ তুমিও হবে। বরং বেশী করে হবে। চাঁদার সঙ্গে লড়তে পারবে তুমি ? তার চেয়ে আপোষে ভাগটা আদায় করে নিতে পারলে কাকা তোমার জব্দ হত গৌর।'

বাঁড়ুয্যে এক খদ্দেরের জন্য আড়াইসের চিনি ওজন করতে করতে বলল।

'আমিও তাই বলছিলাম বাবু। ও মোটে কান দিলে না।'—রহিম সাগ্রহে সায় দিল।

একেবারে নালিশ ঠুকে কাকাকে শাস্তি দেবার কথা সনৎ মোক্তারের পাল্লায় পড়ার আগে গৌরও ভাবেনি। উত্তেজিত, উল্লসিত অভিভূত করে সনৎ মোক্তার কি যেন করে দিল তাকে, কি যেন করিয়ে নিল তাকে দিয়ে! এখানে এই পাকা লোক দুটির ঠাণ্ডা সাহচর্য্যে জুড়িয়ে গিয়ে ক্রমেই মনটা দমে যাচ্ছে, একটু বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে। সনৎ মোক্তারের হাতে গিয়ে যে কি করে পড়ল তাও সে এখন ঠিকমত ঠাহর করে উঠতে পারছে না। তার জন্যই যেন ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল সনৎ মোক্তার, ছোঁ মেরে তাকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল চোখের পলকে। খানিক আগে পর্য্যন্ত তার মনে হয়েছিল ওর মত ক্ষমতাবান দরদী ও শুভার্থী যেন জগতে আর নেই, এই একটি লোকের হাতে সব ভার, সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমোতে পারে!

নালিশ করার আগে রঘুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করার কথা বা মাকে একবার জানাবার কথা পর্য্যন্ত তার মনে পড়তে দিল না সনৎ মোক্তার!

বাঁড়ুয্যে বলল, 'ফসল চাঁদা কাকে বেচে দিয়েছে জানিস? নীলকণ্ঠ বাবুকে বেচে দিয়েছে, তোদের ওই হরেনাম নীলকণ্ঠবাবুকে।'

ভয়ের জেদি সাহসে গৌর বলল, 'বেচে দিক্ না। টাকার ভাগ দেবে।' সাহসটা আরো বেশী প্রকট করে দেখাতে চেয়ে রহিমকে বলল, 'দু'আনার দামটা তোমায় দেব, তুমি ভেবো না।'

আর দু'জন খদ্দের এসেছে সওদা নিতে—ছেঁড়া ময়লা শাড়ী পরা শীর্ণ রুক্ষ একটি বৃদ্ধা আর পথে কুড়ানো তালি দেওয়া হাফ-প্যাণ্ট পরা

চিন্তামণি

সাত আট বছরের একটি ছেলে। বাঁড়ুয্যে এদের সওদা দেয় না, বাম প্রান্তে নীচু কাঠের বাক্সে বসে এদের কম কম জিনিষ দেয় বঙ্কি। বঙ্কির চারিপাশে মুদীখানার সব জিনিষই সাজানো আছে, তবে ছোট ছোট পাত্রে, কম পরিমাণে। বাঁড়ুয্যের এই আড়তের মত বড় মুদী দোকানের কোণে ওখানে যেন আরেকটি ছোটখাট ভিন্ন দোকান করা হয়েছে। বঙ্কির বাটখারাটিও ছোট—অনেকের অধিকাংশ সওদা দিতে সেটা ব্যবহারও হয় না। এক পয়সা আধপয়সার জিনিষ কি কেউ ওজন করে বেচে!

বুড়ী বলে, 'এক ছিদাম নুন, এক ছিদাম ধনে, আধপয়সা—'

বঙ্কি বলে, 'ছিদাম নেই গো! আধপয়সার কম নেই।'

ক'মাস আগেও ছিদামে বেচা ছিল। মোট এক পয়সা পূরলেই হত। কেবল বাঁড়ুয্যের দোকানে নয়, অনেক দোকানেই। দু'পক্ষেরই এতে লাভ। শাকপাতা শুঁকা বা মেছোবাজার কসাইখানার কুড়োনো পটকা হাড় কাঁটা, নাড়ীভুড়ি কাণ যাকে রাঁধতে হবে দু'পয়সার তেল মশলায়, সে একটু একটু সব জিনিষ কিনতে পারে। ছিদামের জিনিষ বলে দোকানীও এতটুকু দিতে পারে জিনিষ যে একসের জিনিষ বেচে দাম ওঠে দু'সেরের। রমেশবাবু একবার এক ছিদামের নুন আর তিন ছিদামের চিনি কিনে কিনে পয়সা পূরিয়ে সওদা করিয়েছিলেন মোট চার আনার—এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। তারপর একসঙ্গে পয়সা দিয়ে ওজন করে কিনিয়েছিলেন এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। ষোলবারে কেনা সমান পয়সার নুন একবারে কেনা নুনের হল অর্দ্ধেক, চিনি তারও কম। ডগসন মাঠের এক সভায় রমেশবাবু তার এই অর্থ-নৈতিক পরীক্ষার কথাটা এমনভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে গৌরের ধাঁধাঁ

লেগে গিয়েছিল। তারপর ভেবে চিন্তে সে দেখেছে, এক আধপয়সার জিনিষ কিনলে দোকানী ঠকায়, তার এবং সকলের এই জানা কথাটাই রমেশবাবু একটু অন্যভাবে জটিল করে বলেছেন।

ছিদামের কারবার এখন আধপয়সায় উঠেছে। কারণ সবচেয়ে কম দামী জিনিষও ছিদামে যতটুকু দেওয়া হত, তার চেয়েও কম জিনিষ কোন কিছুর বিনিময়েও মানুষ মানুষকে দিতে পারে না।

বুড়ী বলল, 'তবে আদলার নুন আর আদলার হলুদ দাও।'

'আরেক পয়সার ?'

'আর নয়।'

'পয়সা আছে ?'

বুড়ী একটা আনী বাড়িয়ে দিল। বাকী তিনপয়সা তার কিসের বরাদ্দ কে জানে !

বঙ্কি মাথা নাড়ল।—'দু'পয়সার কম সওদা নেই।'

এতক্ষণে বুড়ী গেল চটে।—'নেই তো নেই। ভারি দুকান দিয়েছে।'

বুড়ী চলে যায় কিন্তু আধপয়সা একপয়সা করে' আনা দু'আনার খদ্দের ক্রমে বাড়তে থাকে। বঙ্কি ক্ষিপ্রহস্তে একটু মসলা এক চামচ নুন, আধপলা তেল, কিছু চাল কিছু ডাল ইত্যাদি বেচতে থাকে। এত তাড়াতাড়ি এত জনকে এত জিনিষ এত বিভিন্ন দামে সে বিক্রী করে কিন্তু পয়সার হিসেবের জন্য তাকে ভাবতে হয় না, হিসাবে ভুলও হয় না একটা আধলার।

দেখে, চাঁদকাকাকে জব্দ করতে সনৎ মোক্তারকে, আদালত আর আদালতের লোককে দিতে যা খরচ করেছে তার জন্য বড়ই আপশোষ জাগে গৌরের। আত্মপ্রসাদের সঙ্গে জাগে। সে গরীব চাষী, কিন্তু

এদের মত গরীব নয়। এরা সব বাড়তি ফেলনা মানুষ। চাষীও নয়, কুলীও নয়।

দুধ দিতে গৌরকে আর নীলকণ্ঠের বাড়ী যেতে হয় না। দাম বাড়িয়ে দুবেলা সামনে দুইয়ে দুধ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ধর্ম্ম সাক্ষী রেখে সকলেই নির্জলা খাঁটি দুধ কষ্ট করে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়, কিন্তু অপরপক্ষ কষ্ট করে এসে সামনে দুইয়ে দুধ নিতে চাইলে দর একটু বাড়াতে হয়। ধর্ম্মের দুধের চেয়ে সামনে দোয়া দুধ বোধ হয় খাঁটি হয় বেশী।

কাজটা আয়ত্ত করেছে চিন্তামণি। ভোর যখন শুধু আবছা আঁধার তখন সে পাত্র হাতে ঘুমন্ত পুরী থেকে বেরিয়ে যায়, গৌরের সজাগ বাড়ীতে পৌঁছায় আবছা আলোর ভোরে। বিকালে একটু বেলা থাকতেই আসে, সঙ্গে আনে গিন্নিমার কোলের ছেলেটিকে। ঠেলাগাড়ী চেপে বেড়াবার বয়স হয়েছে ছেলেটার।

ভোরে গৌর বাড়ী থাকে। বিকালে কোনদিন থাকে, কোনদিন থাকে না। ভোরে দুধ নিয়ে ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি, বাবুদের চা হবে। বিকালে সময় থাকে, পাড়ার এবাড়ী ওবাড়ী একটু বেড়ায় চিন্তামণি। বিকালের দুধটা তার সামনে দোয়া হয় কদাচিৎ।

তাতে অবশ্য আসে যায় না কিছু। দুধে জল একটু তার সামনেই মেশানো হয়। সে সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছে।

গৌরের মা খ্যান খ্যান করত, 'একপো কমিয়েছে টাকায়, একপো! পোষ'য় বাছা দুধ জুগিয়ে এ আক্রার বাজারে?'

গৌর সায় দেয়।—'ভাল মানুষ পেয়েছে কিনা, সবাই মোকে ঠকায়।'

একদিন দু'দিন চিন্তা করে চিন্তামণির মাথায় বুদ্ধি খেলেছে।

'জল মেশাও না কেন? যাতে পোষায় এমনি করে জল মিশিয়ে দাও!'

'তুমি গিয়ে লাগাবে না?'

'ইস, সাতপুরুষের কুটুম কিনা ওনারা, লাগাতে যাব! মেশাও তুমি জল।'

তার আপনপণার ঘটা দেখে গৌরের মা কুরিয়ে কুরিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। ছেলে তার পুরুষ তো বটে, বিয়ে যদ্দিন না করেছে মেয়েলোক একটা ঘাঁটে তো ঘাঁটুক, সস্তা আর বাজে মেয়েলোক। কিন্তু পীরিত জানা সোহাগ-বেতর পুরুষচাটা এ মাগীর খপ্পরে পড়লে ছেলে তো তার বিগড়ে যাবে!

দুধ নিতে এসে চিন্তামণি বেড়াতে গেছে রঘুর বাড়ী, কাকার নামে নালিশ করার বিগড়ানো মন নিয়ে নিজের বাড়ী না ঢুকে গৌরও এল রঘুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। বাবুর ছেলেকে চিন্তামণি কোলে নিয়েছে, রঘুর মেয়ে তার ছোট ভাইবোন দুটিকে ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে মহোল্লাসে উঠানময় হাওয়া খাইয়ে বেড়াচ্ছে।

চিন্তামণির কাঁখে বাবুর ছেলে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে, তার খেয়ালও নেই। তার নিজের চোখে জল, ধরা গলায় সে বিরজাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছে। রঘু বসেছে একটু তফাতে, তাকেও শোনাচ্ছে। দুঃখের কাহিনী কোন জাতের কোন মেয়ে কোনদিন বলে শেষ করে উঠতে পারে নি। গৌর এসে পড়ায় চিন্তামণিকে থামতে হল, আঁচল দিয়ে চোখ মুচতে হল।

গৌর তাকিয়ে থাকে। চিন্তামণির দরদ আছে তার জানা ছিল কিন্তু সে যে কাঁদতে পারে আজ এই মাত্র যেন তার সে বিশ্বাস জন্মালো একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে।

'কাঁদছ কেন গো ?'

'কপালে আছে কাঁদছি।'

এ জবাবে রহস্যের মুখ ঝামটা আছে, সেটা বেমানান হওয়ায় গৌর অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কাল পর্যন্ত চিন্তামণি তাকে তার সমস্ত দুঃখের কথাই বলেছে। এর মধ্যে এমন কি ঘটল তার কপালে যে বলতে গিয়ে তাকে কাঁদতে হচ্চে ?

'সব তো জানো, আর জিগ্‌গেস করছ কি ?'

তখন গৌর বুঝতে পারে যে নতুন কিছু হয় নি, তাকে যে সব কাহিনী বলবার সময় সে শুধু অদৃষ্টকে শেপেছিল আর ভগবানকে বলেছিল মুখপোড়া, বিরজা মেয়েমানুষ বলে আজ তাকে সেই সব কাহিনী বলার সময় সে আজ কেঁদেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে গৌর রঘুকে বলল, 'তোমার কাছে এলাম রঘুদা। একটা কাণ্ড করেছি।'

'বটে ?' রঘু বলল।

'ওমা, সিকি !' বলল চিন্তামণি।

গৌর তার নালিশ করার কথা বলে, মেয়েরা উৎসুক হয়ে কাছে সরে আসে। বাবুর ছেলের কান্না থামাতে একটু আদর করেই চিন্তামণি বিরক্ত হয়ে তাকে একটা চড় বসিয়ে দেয়। তাতে কান্না আরও বেড়ে গেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন উপায় না দেখে সে করে কি, কাপড়ের তলে খোকার মাথাটা ঢুকিয়ে স্তনের বোঁটা তার মুখে গুঁজে দেয়। বিরজা মুচকে একটু হাসে।

রঘু যেন আনমনে শুনে যায়, না করে কোন আওয়াজ, না দেখায় কোনরকম ঔৎসুক্য। একটু কেমন ঝিমিয়ে গেছে রঘু আজকাল, কেমন একটু নিরাসক্ত ভাব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। চলতি কিছুর

গতি একটু কম হওয়ার মত জীবন্ত থাকার হাজার হাজার রকমসকম-গুলি আগের চেয়ে একটু শ্লথ হয়েছে—একটুখানি। দুর্গার শোক এখনো তার থাকা সম্ভব নয়, নেইও। শোক কারো চব্বিশ ঘণ্টা থাকে না। একটা মানুষ আছে আছে হঠাৎ একটু ডুকরে কাঁদল নয় বুক চাপড়ে হায় হায় করল নয় মুখে মেঘ নামিয়ে আনল—সেটা হল শোক। রঘুর একটু বদল হয়েছে, যার বাড়া কমা নেই, যাতে অসাম্য নেই। বরাবর সে এমনি হলে লোকে জানত যে লোকটাই এমনি। কিন্তু দুর্গা মারা যাবার পর সে বদলেছে বলে সময় সময় মানুষ সেটা টের পাচ্ছে।

সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে গৌর বলে যায়, এদিকে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে আকাশে। সন্ধ্যার আগে বাবুর ছেলেকে বাড়ী ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে মুস্কিল হবে চিন্তামণির, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না শুনে সে উঠেই বা যায় কি করে? উসখুস করতে করতে সে একসময় উঠে দাঁড়ায়।

'শোন, তোমায় বলতে ভুলে গিইছি। বাবু তোমায় ডেকেছেন!'

'সকালে যাব।'

'উহুঁ, আজকেই যেও। এখখুনি নয়, খানিক পরেই যেও কথাটাণ্ডা বলে। যেও কিন্তু, হ্যাঁ। ভারি দরকার—বাবু বললেন, চিন্তামণি, গৌরকে সন্দের পর আসতে বোলো, ভারি দরকার।'

চিন্তামণি চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে গৌর রঘুকে প্রশ্ন করল, 'কি করি বল দিকি এবার?'

'কি করবে? তাইতো বটে। মুস্কিল হল।'

ভেবে চিন্তে পরামর্শ একটা রঘু দিল, গৌরের সেটা পছন্দ হল না। মামলা যখন ঠুকেই দিয়েছে তখন মামলা চলুক, একি একটা পরামর্শ হল! মামলা করার, সাক্ষী দেওয়ার অভ্যাস রঘুর, সে কি বুঝবে প্রথম

উত্তেজনা কেটে যাবার পর ফাঁদে পড়া জন্তুর মত এখন কি হচ্ছে গৌরের মধ্যে !

কিন্তু না, দুর্গা রঘুকে কাবু করে বোকা বানিয়ে দেয়নি।

'আপোষ ? তুই বড় বোকা গৌর ! মামলা হলে কি আপোষ হয় না ? আগে আপোষের চেষ্টা যখন করিসনি, এখন চুপ করে থাক। সমন পেলে চাঁদ মাইতি নিজে আসবে নয়তো তোকে ডেকে পাঠাবে। তখন আপোষের কথা হবে।'

বিরজা উচ্ছসিত হয়ে উঠল, 'ওকে তুমি কি শেখাবে ? সাঁতর দের ও সাতঘাটের জল খাইয়েছে।'

প্রশংসায় খুসী হওয়ায় রঘুর মুখে হাসি ফুটল। হাত বাড়িয়ে বিরজার বুক থেকে সে মেয়েটাকে টেনে নিল নিজের কোলে। মেয়েটা মাই টানছিল বিরজার, মুখ থেকে মাইটা ছেড়ে যাবার সময় একটা শব্দ হল অদ্ভুত, যুবকযুবতীর সাবেগ ও স্বাধীন চুম্বনের মত।

গৌর বিদায় নিচ্ছে, রঘু শুধোল, 'ফসল বেচে দিয়েছে তোর কাকা ? ব্যাপার ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না রঘু। অনেকে বেচছে। কত লোক দর দিচ্ছে, বেচার জন্য ফুসলাচ্ছে, সবুর সইছে না। মাঠের মাল বেচাকেনা হয়, এত তাগিদ কিসের এবার ?'

'ঠিক। আমিও তাই ভাবছি। মিল কটার তাগিদ বেশী—আর ওই ভুবন সা আর বাঁড়ুয্যের। বেচবে নাকি ?'

'নাঃ। ধরে রাখছি।'

হরেণাম রাইস মিলের পূবের প্রাচীর ঘেঁষে বড় রাস্তা থেকে নীল-

কণ্ঠের বাড়ীর সদর পর্য্যন্ত কাঁকড়ের সড়ক। আধখানা চাঁদের মৃদু আলোয় এই সড়ক ধরে গৌর চলেছে, প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোট দুয়ারটির ওপাশ থেকে চিন্তামণি চাপা গলায় ডাকল, 'এই! এই! গৌর? এই!'

গৌর ভাবছিল তার সঙ্গে নীলকণ্ঠের হঠাৎ কি জরুরী দরকার পড়ল, ডাক শুনে সে চমকে উঠে ভড়কে গেল একেবারে। আরও ভড়কে গেল চিন্তামণি যখন দুয়ারটা ভেতর থেকে বন্ধ করে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল মিল অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নির্জনতায়, টিনের শেডটার গোপন আড়ালে। চমক লাগার দপদপানি কমবার আগেই বুকটা তার টিপ টিপ করতে লাগল অসম্ভব কল্পনায়।

মিলের কাজ একরকম বন্ধ হয়ে আছে আজকাল, যদিও নতুন ধান নিয়ে জোর কাজ আরম্ভ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। পাকা উঠানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে ধানের মড়াইএর চালার মত ধানঢাকা মটকাগুলি,—শেডের ভেতর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় রহস্যের মত কিছু একটা নিশ্চয় চাপা দেয়া আছে ওগুলির তলে, তলার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এসে যা উঠানময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে চোখের ধাঁধার মত।

কি সে না শুনেছে আর কি সে না জানে নারীপুরুষের ব্যাপার? তবু ক্ষণে ক্ষণে হৃদ্‌কম্প হতে থাকে গৌরাঙ্গের। মানুষ কি বলে আর কি করে মেয়েমানুষকে নিয়ে এ অবস্থায়? চিন্তামণি যদি হেসে ফেলে! চিন্তামণি যদি নীলকণ্ঠের সেই বড় মেয়ে তরুবালার মত গালে তার টোকা মেরে বলে, 'আ মরণ!'

'রাগ করেছ? বাবুর নাম করে ডেকে এনেছি বলে?'

'উঁহু । না ।'

'ওদের সামনে কি করে বলি আমার সাথে দেখা কোরো ? তাইতে বাবুর নাম করলাম ।'

'বাবু ডাকেনি ?'

'না গো না । আমি ডেকেছি, সব শুনব বলে । না শুনে যে চলে এলাম । তবু কত কথা শোনালে মাগী একটু দেরীর জন্যে, দাসী বৈ তো নই ! তারপর কি হল ? ওই যে বলছিলে ফসল বিক্রী করে দিয়েছে না কি করেছে তোমার কাকা ?'

গৌর একটু ধাতস্থ হয় । একটু জ্বালাও বোধ করে কেমন এক ধরণের ।

'এই জন্যে ডেকেছ ? সকালে শুনলে হ'ত না ?'

'রাতে ঘুম হত ভেবেছ আমার ?'

শুনে দেহমন যেন চোখের পলকে উল্লসিত হয়ে সাম্য লাভ করায় গৌরের ভয়ভাবনা উপে গেল । উঁচু টানে বাঁধা তারের মত টন টন রণ রণ করতে লাগল সে ।

সহজ সরল ভাবে সে বলে গেল সব কথা । রঘুকে যতটা বলেছিল তার চেয়ে বেশী, অন্য ভাষায়, অন্য কায়দায় । তার ভয় ভাবনা আপশোষের কথা সে বর্ণনায় আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে গেল ।

চিন্তামণি জোর দিয়ে বলল, 'না মামলা কোরো না । কাল গিয়ে বাতিল করে দিও নালিশ । আপোষে যদি ভাগ পাও তো পাবে নইলে কাজ নেই ।'

'টাকাটা মাঠে মারা যাবে নালিশের ।'

'বোকার মত কাজ করলে ওমনি যায় ।'

অতিবেশী অন্তরঙ্গ আপনজনের মত চিন্তামণির এই বকুনি শুনে গৌরের সাহস যেন বেড়ে গেল। শেড়ে ভেজা ধানের পচাটে গন্ধ অনুভব করতে করতে ফাটল ধরা চোকলা ওঠা সিমেণ্টের নোংরা মেঝেতে ঘষরে গিয়ে সে চিন্তামণির গা ঘেঁষল। চিন্তামণি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আ মরণ!'
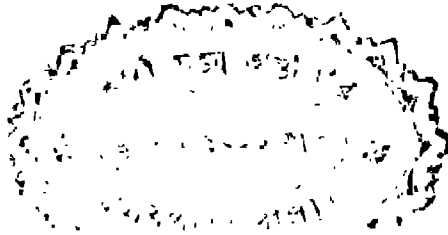
চার

ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। ঋণের বোঝায় চাষী কাতর। ফসল ঘরে তোলা তক্ কটা দিনও কিছুতে কাটাতে না পেরে এখনো বাজু পৈছা ঘটি বাটি বাঁধা পড়ছে। পেট ভরে কজনেই বা কবে তারা খায়, এখন তাতেও টানাটানি পড়েছে ফসল তোলার আগে, সিকি থেকে আধেক নেমে গেছে সেই অ্যাত্টুকু খোরাক। মাটির কুঁড়েয় কজনেই বা কবে তারা হাসে, এটুকু তবু যে ভোঁতাটে খুসী খুসী দেখাত তাদের মুখ সে মুখে ঘনিয়েছে প্রাণহানিকর বিমর্ষতা। মাঠে মাঠে এমন যে ভাল ফসল হয়েছে এবার, তা দেখেও না জুড়োচ্ছে তাদের চোখ, না থামছে দেহমনের পোষমানা শান্তশিষ্ট নালিশ-ভোলা জ্বালা। এমন দিনে চাষী হয়েও গৌরের মনে কিনা থৈ থৈ করছে মহুয়ার মিঠে নেশার মত সুখের মাতলামি! একটা মা নিয়ে তার সংসার, সে সংসার ঘাড়ে চেপেছে এই সেদিন, সে কি জানবে চাষ করে বাঁচার কত মজা! চাঁদ বেশ কৃপণ আর হিসেবী। তার সাথে থাকার সময় বরং গৌর খানিক খানিক স্বাদ পেয়েছে গরীব চাষীর খাওয়া পরার কষ্টের। শুধু ওই কষ্ট, মনের কিছু নয়। অনেকের দায়িক হয়ে অবিরাম ঠেঙ্গানো খাওয়া ভীরু মন ভাবনার ভারে যে ভাবে ধুঁকতে থাকে সেটা সে এখনো শিখতে পারে নি। কম করে শ'খানেক ওরকম আধমরা মানুষের সঙ্গে তার জানা শোনা আছে, তবু। চাঁদ কাকার কাছে ভাগ পেয়ে সবে ভিন্ন হয়ে মা আর গাইটা পুষে সে একরকম সুখেই আছে এখনো। গাইটিও আবার রোজ্গেরে। অঢেল প্রেমে গা ঢেলে দিতে তার বাধা কই?

চিন্তামণি

চিন্তা বলে যায়, 'আজ যেও।'

বলে যায় সাঁঝের আগে। তারপর সন্ধ্যা নামে তো রাত আর বাড়ে না গৌরের। মন যত চনমন করে অধীরতায়, গা যেন ততই থমথম করে ধৈর্য্য ধরার জ্বরে। সেদিনের চাঁদ ক্ষয়ে গেছে অনেকখানি, মাঝ রাত্রি পেরিয়ে তবে ওঠে। মাঝ রাত্রির অনেক আগেই গৌর তারার আলোয় পথ দেখে রওনা দেয় হরেণাম রাইস্ মিলের দিকে।

মা বলে, 'কুথা যাস বাবা? রেতে?'

'রঘুর সাথে সলা আছে।'

দরজার হুড়কো খোলা তক মা চুপ মেরে থাকে। তারপর আচমকা বলে, 'বিয়া করলে হয়। রেত বিরেতে বাইরে যাওয়া ভাল না বাবা।' বাইরে যেতে নিষেধ করা নয়, সমালোচনা নয়। একটু বিবেচনা করতে বলা, ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখতে বলা যে একটা বিয়ে করলেই যখন চলে, এত হাঙ্গামায় কাজ কি।

'ওসব কিছু না। কপাট দে।'

তা বটে। বিয়ে একটা করলে হয়। চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে কথাটা বেশী করে গৌরের মনে জাগছে, মার মনে পড়িয়ে দেবার কোন দরকার ছিল না। বিয়ে করার মানেও যেন তার কাছে বদলে গেছে, একটা অস্পষ্ট অভাব বোধের চাপ পরিণত হয়েছে নতুন পীড়িতের মন-কেমন করা ঔৎসুক্যে। চিন্তামণির জন্য সারাদিন তার ছটফট করার ভাগ কচি বয়সের বাড়ন্ত বৌদের পাওনা হচ্ছে, তাকে তারা টানছে চিন্তামণিকে নিজেদের টান ধার দিয়ে। নইলে চালকলের দিকে রওনা দিয়েও যার জন্য রওনা দেওয়া সেই একজনকে ছাড়া তার কেন

চিন্তামণি

মনে পড়বে ভোলার মেয়ে কালী, রঘুর ভাগ্নী পাঁচী, কেষ্ট শম্ভু পরাণ রসিকদের নতুন বৌ আর দাঁতপুরে তার মামাবাড়ীর পাড়ায় যে একটা মোটাসোটা মেয়ে থাকে, এদের কথা? এসব ভাল লাগে না গৌরের। ভেসে যাওয়ার সুখে মসগুল হয়ে তীরে ওঠার কথা ভাবে, একি জলের বানে ভাসা নাকি তার, অ্যাঁ?

চাষীর গাঁ কখন ঘুমিয়েছে, তার কত পরে বাবুর বাড়ী সংসারের পাট শেষ হয়ে ঘরে ঘরে আলো নিভেছে আন্দাজ করে সে পথে বেরিয়েছে। হয়তো এই একটানা দীর্ঘ প্রতীক্ষার উত্তেজনা শেষ হওয়ার সময় এসেছে বলেই মনটা তার বিমর্ষ হয়ে ঝিমিয়ে যায়। এ প্রণয় তার জুড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে একটা তামাসায় দাঁড়িয়ে যাবে? সে তামাসা আজ কি গৌরের সয়!

ঘেরা শেডের নীচে পচা ধানের গন্ধ পারে না, কিন্তু তারপর চিন্তামণি এলে তার একরাশি চুলে পচা নারকেল তেলের গন্ধ তাকে বাঁচায়। চোখের পলকে সে টের পায় চিন্তামণিকে ছাড়া সে তো বাঁচবে না!

কিছু রাত হাত রেখে চিন্তামণি বলে, 'ইবারে এসো। এট্টু না ঘুমোলি বাঁচবো নি।'

শক্ত মেঝেতে শুধু একটা চাদর বিছানো বালিশহীন শয্যা ছেড়ে গৌর উঠতে চায় না। বেজার হয়ে বলে, 'কাল ঘুমিয়ো, দুকুর বেলা।'

চিন্তামণির হাসির সঙ্গে হাই উঠে।—'কাজ নেইকো? মোর কাছে বাচ্চা দুটো গছিয়ে গিন্নিমা দুপুরে ঘুমোয়। মজার কথা বলি শোন, ঘুমুলে গিন্নিমার নাক ডাকে! মাইরি বলছি—তোমায় ছুঁয়ে। মেয়ে মানুষের নাক ডাকা! হাসি যা পায়।' আবার হাই তুলে চিন্তামণি বলে, 'দিনভোর খাটতে হয়। ঘুম পাচ্ছে, সত্যি। দুটি ভাতের জন্যে

দেহ পাত করে খাটছি। ভাতার তো নেই দুটি ভাত যোগাবে পোড়া পেটের জন্যে।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে এই কথাটা দু'একবার বলে চিন্তমণি, তার কেউ নেই বলে পেটের জ্বালায় দাসীগিরি করে তার জীবন গেল। শুনে মন খারাপ হয়ে যায় গৌরের। দরদ আর সহানুভূতিতে বুকটা তার ব্যথা করে।

'সত্যি, পরের খাওয়া বড় কষ্ট।'

এত রাতে আদর দিয়ে তার এই কষ্ট দূর করার চেষ্টা চিন্তামণি কাঠ হয়ে গ্রহণ করে। তারপর সে এলিয়ে যায়। তারও পরে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে।

গৌর প্রথমে শুধোয়, 'ঘুমোলে নাকি?' তারপর চোখের জলের সন্ধান পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে তার কান্না কেন, কিসের জন্য। শেষে গভীর দুঃখে আর অভিমানে কাতর হয়ে উঠে বসে বিড়ি ধরায়, নিজের হাঁটু মোড়া পা দুটিকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে।

তখন এক কাণ্ড ঘটে অদ্ভুত। তার পায়ের পাতায় হাত রেখে সলজ্জ খেদের সুরে চিন্তামণি বলে, 'মাপ করো। শুনছ? মাপ চাইছি তোমার ঠেঁয়ে। আর কিছু চাইনে আমি, সত্যি চাইনে। যদি চাইতো খান্‌কি বোলো মোকে।'

ঘুমে যে ঝিমিয়ে গিয়েছিল এমন হঠাৎ তার আবেগের তীব্রতায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গৌরের। পা ছেড়ে মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে এত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে চিন্তামণি যে এক মুহূর্তে যুবক গৌর নিজের কাছে শিশু হয়ে যায়।

চিন্তামণি

ভোরের আগে একটু শীত শীত ভাব দেখা দিয়েছে। বাড়ী ফেরার পথে শান্ত অবসন্ন মন দিয়ে গৌর বুঝবার চেষ্টা করে, তার কাছে কি চায় না চিন্তামণি, কি চাইবে না কখনো। এর মধ্যে কোনদিন সে কি কিছু চেয়েছিল তার কাছে, কোন আব্দার জানিয়েছিল, সে কাণে তোলেনি? সে কি পয়সা কড়ি চায় তার কাছে? কাপড় গয়না? মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞেস করতেও খেয়াল হয়নি বলে গৌরের আপশোষের সীমা থাকে না।

পরদিন দুধ নিতে এলে দেখা গেল চিন্তামণির মুখ চোখ ভারি দেখাচ্ছে। একনজর তাকিয়েই গৌরের মনে হল সে ভয়ানক রাগ করেছে, মুখ ভার করে আছে দুরন্ত অভিমানে। তাদের ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছু যে ঘটতে পারে জগতে গৌরের আজকাল সেটা খেয়াল হতে চায় না।

'না না। রাগ করিনি। গিন্নিমাকে ফাঁকি দিয়ে দু'কুরে খুব এক-চোট ঘুমিয়ে নিয়েছি। তুমি বললে না কাল?'

'জ্বরজারি হয়নি তো?'

'এট্টু হয়েছে।' দুধ দোয়া বন্ধ করে গৌর ফিরে তাকাতে সে বাঁকা চোখে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'পীরিতের জ্বর গো। তোমায় দেখে সারল।'

গাই বাছুরের গা চাটে, দুধের পাত্রে চোঁক চাঁক শব্দ হয়, মৃদুস্বরে তারা আলাপ করে। গৌরের প্রশ্নের জবাবে চিন্তামণি গভীর এক রহস্য সৃষ্টি করে জানায় যে কই, সে তো কিছু চায় নি গৌরের কাছে! কিছু যদি তার চাওয়ার থাকেই, গৌর নিজে থেকে তাকে তা দেবে, সে চাইতে যাবে কেন! তবে কিনা, একটু ভয় করছে চিন্তামণির, এভাবে কতদিন

তাদের দেখাশোনা চলবে ? রোজ তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ দেখে গিন্নিমা বোধ হয় সন্দেহ করেছে মনে হয়। এমন করে তাকাচ্ছে গিন্নিমা আজ কদিন থেকে, এমন সব কথা বলছে তাকে বকবার সময় !

'আজ আবার পটলবাবু মস্ত একটা তালা সেঁটে দিয়েছে মোদের ঘরটার কপাটে।'

'জেনেছে নাকি পটলবাবু ?'

গৌরের বিবর্ণ মুখ দেখে আর আর সচকিত প্রশ্ন শুনে চিন্তামণি খানিক তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, শেষে নীচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে নিয়ে বলল, 'নতুন ধান আসবে বলে তালা দিতে পারে।'

'জানাজানি হলে মুস্কিল।'

'কি মুস্কিল। কার মুস্কিল ! তোমার নাকি ?'

গৌর চুপ করে থাকায় সে আবার বলল, 'তুমি তো পুরুষ মানুষ।'

পাকা লোক হলে গৌর মনে করিয়ে দিতে পারত যে সে বিদেশিনী, শুধু দেশে ফিরে গেলেই যার আসান হয় সে আর এমন কি মুস্কিল ! অত হিসাব গৌর এখনো শেখে নি।

'তোমার আমার দু'জনেরি মুস্কিল। তুমি কি করবে ?'

'কি আর করব, দেশে চলে যাব।'

তা বটে। চিন্তামণির সে উপায় আছে। আটকা পড়বে সে, তার তো পালাবার পথ নেই। অবেলার ঘুমে চিন্তামণির ভারি মুখ যে অন্ধকার হয়ে এসেছে গৌরের আর তা নজরে পড়ল না। নিজের মুখ তার শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। তার গোপন প্রেমের অনেকগুলি বিপজ্জনক পরিণতির সম্ভাবনা আচমকা হুড়মুড় করে তার বুদ্ধি-বিবেচনার ঘাড়ে এসে পড়ায় সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঘুরে ফিরে একটা

কথাই কেবল তার মনে পড়তে থাকে যে এ শুধু তার চাষীর সমাজে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের জানাজানির ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে যোগ আছে বাবুদের। চিন্তামণিকে মধুবনীতে নিয়ে এসেছে পটলবাবু। বাবুরা যদি তাকে শাস্তি দেয়, যদি বিপদে ফেলে, যদি জেল খাটায়, জানাজানি হয়ে গেলে! চাষীর সমাজে তার শুধু একটু দুর্নাম হবে, কিন্তু বাবুরা রাগী, মানী, নিষ্ঠুর মানুষ. প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের গায়ের জ্বালা কি জুড়োবে সহজে!

পরদিন সকালে গৌর মামাবাড়ী রওনা হয়ে গেল। তার মনে হল, কদিন একটু দূরে গিয়ে থেকে আসাই ভাল। রঘুকে বলে গেল, মাকে যেন দেখাশোনা করে, গরু দুইয়ে দুধ যেন যোগার দেয় বাবুর বাড়ী।

'মামাবাড়ী হঠাৎ কেনে?'

'বড়মামা একটা বাছুর দেবে বলেছিল, নিয়ে আসি।'

গৌরের মামাবাড়ী দাঁতপুরে। বাসে প্রায় আধঘণ্টার পথ পৃথীপুর, সেখান থেকে দু'কোশ দূরে সিউতি নদী পেরিয়ে দাঁতপুর। নদী খুব চওড়া কিন্তু মোটেই গভীর নয়, দুটি তীর নদীর তল থেকে মানুষ সমান উঁচু হবে কি হবে না। বর্ষার ক'মাস নদীতে লাল জলের স্রোত বয়ে যায়, ময়লা থিতিয়ে জল পরিষ্কার হতে না হতে জল যায় ফুরিয়ে। একতীর ঘেঁষে ছোট একটি ঝরণার মত স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে যায়, নদীর বিস্তীর্ণ সমতল বুকে বালি চিক চিক করে।

বাস আজকাল বন্ধ। ট্রেনে চেপে গৌর সিউতি নদীর পুল পেরিয়ে সানকানি ষ্টেশনে নামল। এদিকে শালবন বেশী, ছোট ষ্টেসনটির লাল কাঁকড় বিছানো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে কিছুদূর গিয়েই রেল-লাইনের দুপাশে শালবন সুরু হয়েছে।

চিন্তামণি

ষ্টেসনের বাইরে একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো কোথায় কুলির কাজ করতে যাবে, রান্নাখাওয়ার জন্য এবেলা এইখানে ঠাই গেড়েছে। কালো মাটির হাঁড়িতে ভাত চেপেছে, কুপিয়ে কাটা হচ্ছে মোটা একটা ঢ্যামনা সাপ। রান্নার এই মাটির হাঁড়িকুড়ি সব সঙ্গে নিয়েই এরা রওনা দেবে, পুরুষ ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা টানবে শালপাতা পাকানো মোটা বিড়ি, মায়েরা কাপড় দিয়ে শিশুদের বেঁধে নেবে পিঠে। সাঁওতালদের চাষের কাজ অতি সামান্য, বনের ধারে বা বনের মধ্যে জঙ্গল সাফ করে যেমন তেমন খানিক ফসল ফলায়, তাও সকলে নয়। তবু এদের বড় ভাল লাগে গৌরের, জন্ম থেকে এদের চলাফেরা চালচলন দেখে এলেও ওরা তার মনে একটা রহস্যের সৃষ্টি করে রেখেছে, একটি ছিপছিপে কিন্তু পরিপুষ্ট সাঁওতালী মেয়েকে বিয়ে করার অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা আজও তার মনে উঁকি দিয়ে যায়। অমন মেয়ে চাষীর ঘরে জন্মায় না।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক বেলায় মামাবাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে গৌরের কানে এল একক একটি শানাই-এর সুর। শানাই শুনলে গৌরের মন কেমন উদাস হয়ে যায়, মনে হয় বাকী জীবনটা ঠাকুরদেবতাকে ভক্তি করে, গুরুজনকে মান্য করে আর পরস্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে কেবল ভাল কাজ করে কাটিয়ে দেওয়া চাই। সে মরলে সবাই যেন বলে, লোকটা বড় ভাল ছিল গো।

গৌরের মামাদের মস্ত সংসার, পায়ের ধূলো নেওয়া দেওয়ার পালা সাঙ্গ করে গৌর শুধোল, 'শানাই বাজে কার বাড়ী গো ?'

'কুসুর মেয়্যার বিয়া—লক্ষ্মীর। সেই যে মুটকী মেয়েটা ঘন ঘন আসত মোদের বাড়ী—'

'বটে ?'

চিন্তামণি

বর আজ এসে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলা বিয়ে। আজ কুটুম ভোজন কাল স্বজাতি ভোজন হবে। কুঙ্গুর নাকি ভয়ানক ফাঁকি দেবার মতলব আছে শোনা যাচ্ছে, দই চিঁড়ে আর মোটে একটা করে মিষ্টি দিয়ে সেরে দেবে। জোড়া মিষ্টি না দিলে গোলমাল হবে শোনা যাচ্ছে। কুটুমদের দেবে জোড়া মিষ্টি আর মোয়া, স্বজাতির বেলা শুধু একটা মিষ্টি—সইবে কেন স্বজাতিরা!

'তোর বিয়েতে লুচি খাবো গৌর।'

বড়মামী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল। বড়মামী জীবনে আঁতুরে গিয়েছে সতরবার, একটা বয়সে স্ত্রীলোকমাত্রেরই সন্তান ধারণের ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবার ব্যবস্থা বিধাতার না থাকলে হয়তো আরও দু'চারবার যেত। সতরটি এলেও আটটি সন্তান অতি শৈশবে এবং দুটি অল্পবয়সে চলে গিয়েছে তাই রক্ষা। সাতটির মধ্যে তিনটি মেয়ে পরেরা ঘরে নিয়ে পুষছে, তাও রক্ষা। তাছাড়া, সবগুলি এসে পড়বার আগেই বড় দুটি ছেলে পর পর বড় হয়ে পর পর রোজগার করতে শিখেছে। শেষ বিয়োনোর পর দু'বছর কেটে গেছে, কেন বেঁচে আছে না জেনেই বড়মামী টিঁকে আছে ক্ষয়রোগিনীর মত জীর্ণশীর্ণ শরীর নিয়ে। জ্বর হয় মরে না, কাসি হয় মরে না, হজম না হওয়ায় প্রায়ই কাপড় বিছানা নষ্ট করে আর নিজের মনে অনর্গল কথা বলে বেঁচে থাকে।

বড়মামা অদ্বৈতের বয়স ষাট হবে। চুল টুল পেকে সে বুড়ো হয়নি কিন্তু বৈষ্ণব হয়েছে।

তার অসাধারণ কৃষ্ণভক্তির কথা দাঁতপুর আর আশে পাশের গাঁয়ে ছড়িয়ে গেছে। কতলোক স্বচক্ষে দেখেছে কৃষ্ণলীলার যাত্রার গান ভেঙ্গে চুরে গাইতে গাইতে দু'চোখে তার জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে!

এত লোকের মধ্যে সেই প্রথম উদাসীন আপনভোলা সুরে গৌরের আসবার কারণ জিজ্ঞেস করল।

'বাছুর? বকনাটা? তোকে দিব কথা ছিল নাকি বটে?'

'ছিল না? মা'কে নাহক্ বিশবার বলেছ দুধ ছাড়লে পাঠিয়ে দেবে মাস দুয়েকের মধ্যে নয়তো খবর দেবে, আমি এসে নিয়ে যাব। ও বাছুর আমার মামা, দিতে হবে, চালাকি নয়, হাঁ।'

অদ্বৈত চোখ বুজে গদগদ হয়ে বলল, 'অ গৌর, তোর ভাগ্যি ভাল, বড় ভাল তোর ভাগ্যি।'

গৌর সন্দিগ্ধ হয়ে জিগগেস করল, 'কিসে?'

'বাছুরটি প্রভু গর্হণ করেছেন।'

অদ্বৈতের গুরুঠাকুর এসেছিলেন মাঝখানে, যাবার সময় পাটল রঙের বাছুরটির গলার দড়ি স্বয়ং শ্রীহস্তে ধারণ করে নিয়ে গেছেন। বাছুরটি আগেই যখন গৌরকে দেওয়া হয়েছিল, পুণ্যটা তারই হয়েছে সন্দেহ কি!

'জানিস গৌর, অ বাবা জানিস? বলি শোন তোকে। শোন কি অবাক কাণ্ড। যাবার আগে বলা নেই কওয়া নেই প্রভু তোর কথা শুধোলেন। তখন টের পাই নি, আজ জানছি, তেনা জানতেন। কিরপা করলেন তোকে। ভক্তির লেশটুকুতো মনে তোর নাই কিনা তাই তোর বাছুরটি গর্হণ করে তোকে কিরপা করলেন।'

গৌরাঙ্গ থ' বনে থাকে, আপশোষে আর বিস্ময়ে। কুনুর মোটাসোটা মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে শুনে মনটা তার মস্ত একটা ক্ষতি বোধের চাবুক খেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ছিল ন্যায্য পাওনা ফসকে যাওয়ার ক্ষোভ। এ আরেকটা ক্ষতি, পাওনায় ফাঁকি পড়ায় কিন্তু ভাল করে ক্ষুব্ধ সে হতে পারল না। তার বাছুরটি একজন বাগিয়ে

নিয়েছে ভেবে সে রেগে উঠতে যায়, কিন্তু সেই একজনটি এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতার অধিকারী যে মামারা তাকে বাছুরটি দিয়েছে একথা না জেনেও জানতে পারেন বলে রাগ আর তার করা হয় না।

পুঁই ডাঁটার চচ্চরি আর কুচো চিংড়ির টক দিয়ে তিনটে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে সে ভাত খায়। কাঁসার ভাত শেষ করে একবার চেয়ে ছোট একমুঠো ভাত পেয়েও আবার সে ভাত চাইতে তার মেজ সেজ দুই মামী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আর দুজনেই প্রায় একসঙ্গে অনেক দুঃখের পোড়া একটু হাসি হেসে গৌরকে আরও ভাত দেয়। ভাগ্নে এসেছে মামার বাড়ী, নিজেরা উপোস দিয়েও তার পেটটা ভরাতে হবে বৈ কি মামীদের।

গৌরের মামাদের অবস্থা চিরদিনই মন্দ, দুর্বৎসরে বড় কষ্টে দিন যায়। কিন্তু মানুষ তারা পরম শান্ত, সন্তুষ্ট এবং ধার্ম্মিক, একান্নবর্ত্তী আদর্শ চাষীর পরিবার। গোঁয়ার শুধু গৌরের ছোট মামা রাধাচরণ। তার ঘরে মন নেই, চাষে মন নেই, গাঁয়ে মন নেই। বছরে দু'তিন মাসের বেশী সে বাড়ী থাকে না। কোথায় যায়, কি করে স্পষ্ট করে কোনদিন সে কিছু বলে না, হঠাৎ একদিন কিছু টাকা নিয়ে বাড়ী আসে, বাকী খাজনা বা ঋণ বা অন্যান্য আপদ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয় সংসারকে তখনকার মত, কিছুদিন পরে আবার উধাও হয়ে যায়।

অদ্বৈত বলে, 'মজুরগিরি করে নির্ঘাৎ, কুলী খাটে। চেহারা দেখছ না মজুরের মত হচ্ছে দিনকে দিন?'

কেউ বলে, 'মজুরগিরি করে টাকা আনবে, ইস্ রে!'

অদ্বৈত বলে, 'ভারি টাকা। বিশ পঁচিশটার বেশী টাকা এনেছে কোনবার?'

গৌরের এই ছোট মামাটির একখানি চিঠি এসেছে অদ্বৈতের নামে

চিন্তামণি

দিন তিনেক আগে, এখনো সেই চিঠি নিয়ে পড়াশুদ্ধ মামার বাড়ীটি সরগরম হয়ে আছে। কলকাতার কাশীপুর থেকে শতকোটি প্রনাম দিয়ে রাধাচরণ নিবেদন জানিয়েছে যে চার চারটে যোয়ান মদ্দ পুরুষের বাড়ীতে বসে থাকার কি দরকার আছে বাড়ীর ভাত ধ্বংস করে? বড় আর মেজ ভায়ের বয়স বেশী—তারা ঘরে থেকে চাষ আবাদ দেখুক, তার সেজভাই আর যোয়ান ভাই-পোরা চলে যাক তার কাছে সেই কলকাতার কাশীপুরে, কাজ করে রোজগার করুক তার মত। সে কাজ জুটিয়ে দেবে।

গৌরের কৌতুহল জাগে। 'কি কাজ লেখেনি কো?'

'লিখবার দরকার? মজুরগিরি, কুলিগিরি কাজ, আবার কি। জানিস গৌর, পরভু বলেন, ওটা কংসের সম্বন্দির অবতার, আমার ওই ভাইটা। সংসারটা ওই ছারেখারে দেবে। বাপের কোন অভাব ছিল মোদের? জমিজমা, গাইগরু গাছপুকুর সব ছিল সে থাকার মত। ওটার জন্মো থেকে অবস্থা পড়তে লাগলো মোদের।'

নাম জপের প্রক্রিয়ায় অদ্বৈতের ঠোঁট নড়তে থাকে।

'জবাব দাওনি কো?'

'দিব। জবাব দিব।'

গৌরের যোয়ান যোয়ান মামাতো ভাই রাখাল, প্রসাদ, কানাই বংশীরা মুখ বাঁকায় আর হাসে, হাসে আর মুখ বাঁকায়। ওরা প্রায় সকলেই জোতদার ভূষণ নন্দীর মজুরি করে—জমিতে, চাষের কাজে।

কুনুর বাড়ী শানাই বাজায় চণ্ডী। সস্তা শানাই, খাওয়া আর দৈনিক চার আনা। শানাই বাজানো চণ্ডীর ব্যবসা নয়। বাড়ীতে একটা বাঁশী আছে, আশে পাশে গাঁয়ের কেউ ডাকলে বাজিয়ে আসে। পোঁ ধরারও কেউ তার সঙ্গে থাকে না। তবু তার সেই বেসুরা বেতালা শানাই

গৌরকে উতলা করে দেয়। রাত্রে চাটায়ে শুয়ে শানাইয়ের সুর কানে না এলেও ব্যাকুলতা তার বেড়েই চলে। হাঙ্গামার ভয়ে গণ্ডগোলের প্রথম চোটটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই সে যে পালিয়ে এসেছে এ চিন্তাটিকে সারাদিন আমল দিতে অস্বীকার করেই নিজের কাছে সাফাই গাওয়ার প্রয়োজনকে সে এড়িয়ে গেছে, এখন এসব ভণ্ডামি তার ভালও লাগে না, কাজেও লাগে না।

চিন্তামণির দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। নীলকণ্ঠবাবু তাড়িয়ে দিলে সে হয়তো তার বাড়ীতে আসবে তার খোঁজে, কিন্তু তাকে কিছু না জানিয়ে সে মামাবাড়ী চলে গিয়েছে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে। ভাববে, এমনিই হয়, গৌরের মত লোকের সঙ্গে পীরিত করলে এমনিই হয় শেষতক্।

মামাদের সঙ্গে সে দুপুরে কুন্নুর বাড়ী ফলার করতে গেল। বিয়ে আজ গোধুলি লগ্নে কিন্তু জাতভায়েরা অনুমোদন না করলে বিয়ে হতে পারবে না। দুপুরে সকলের ভোজনটা হবে অনুমোদন! প্রায় জন ত্রিশেক লোক হয়েছে, ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে। এদের মাত্‌বর নবকান্ত মাইতি। তারই আশে পাশে এলোমেলো ভাবে বসে বয়স্কেরা জোড়ায় দু'জোড়ায় নানা কথা আলাপ করছে আর মাঝে মাঝে খিদেয় কাতর ছেলেমেয়েগুলির ওপর খিঁচিয়ে উঠে চড় চাপড় মারছে। কুন্নু দু'বার জোড় হাতে সকলকে তাগিদ দিয়েছে কিন্তু কেউ উঠে গিয়ে খেতে বসে নি। খিদে পেয়েছে সকলেরই, খিদে নিয়েই সকলে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে, কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে সবাই যেন একান্ত উদাসীন!

কুন্নু আবার আসে, বলে, 'বেলা যে অনেক হল! দয়া করে গা তুলতে আজ্ঞা হয় মাইতি মশয়।'

এবার নবকান্ত বলে, 'কুটমদের নাকি একগণ্ডা মিষ্টি মিলেছে কুনু ?'

· 'একগণ্ডা ?' কুনু কপালে চোখ তুলে জবাব দেয় 'একটোর বেশী মিষ্টি দেবার খেমতা আছে যে দেব ? একটা মিষ্টি দিইছি, নার্কলে। আপনাদের জন্যে চন্দ্রপুলি আর মোয়া।'

'মোয়া ?'

'মুড়কি নয়তো মোয়া, যার যা পছন্দ।'

'কটা মোয়া ?'

কুনু একটু ভাবে। চকিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়।

'দুটো মোয়া। মোয়ার বদলি পোয়া মুড়কি।'

তখন সকলে গাত্রোত্থান করে খেতে গেল। কুটুমদের সমান সম্মান আদায় করা হয়েছে, এখন আর ভোজন করতে অপমান নেই।

দাওয়ায় বসে খেতে খেতে লক্ষ্মী বার তিনেক গৌরের নজরে পড়ল। কাঁচা হলুদ মাখিয়ে মাখিয়ে তার নিজের বাদামী রঙ মেয়েরা প্রায় লোপ করে দিয়েছে। কেমন শুদ্ধ আর পবিত্র দেখাচ্ছে মোটা মেয়েটাকে।

গৌর তাকে না বলে আচমকা মামাবাড়ী চলে গিয়েছে শুনে প্রথমটা চিন্তামণি রাগে অভিমানে চারিদিক অন্ধকার দেখেছিল, তারপর ভেতরে কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গিয়ে তার নিজেরই মনে হল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেছে। এমন ভীষণ ভাবে কোন মানুষের কাছে ধরা পড়ার স্বভাব তার নয়। গৌরকে নিয়ে নিজেকে একেবারে বেমালুম ভুলে যেতে বসেছিল, কি এমন মানুষটা গৌর ? চালচুলো ছাড়া কিইবা

আছে ওর যে ওকে নিয়ে মেতে থাকলে তার সুখের সীমা থাকবে না ? কি প্রত্যাশা আছে ওর কাছে ?

অন্ততঃ ক'দিনের জন্য গৌর দূরে চলে গেছে, দিনান্তে তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হবার সম্ভাবনাও এখন নেই, এটা খেয়াল করার সঙ্গে চিন্তামণি আজ প্রথম সচেতন হয়ে উঠল, মনটা তার কিভাবে গৌরময় হয়ে উঠছিল দিন দিন। ঘুম ভেঙে সে ভাবতে আরম্ভ করত গৌরের কথা, দেখা হলে কি বলবে, কি করবে আর কি হবে এই কথাই ভাবত বিভোর হয়ে সারাটা দিন। বাড়ীর গিন্নি আর তার মেয়ের কাছে এজন্য কতবার যে বকুনি খেয়েছে। যা হয়েছে তার জন্য চিন্তামণির কোন আপশোষ নেই। অপরূপ স্বপ্ন দেখার আনন্দেই বরং হৃদয় তার ভরাট হয়ে আছে। গৌরের কথা সে এখনো ভাববে, গৌরের জন্য যে মন কেমন করছে তাও মানবে, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আর নয়। একটু সামলে নিতে হবে নিজেকে, চারিদিকে তাকাতে হবে। দু'এক-জন যে কামনা করছে তাকে, অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায় এমন দু'একজন, তাদের সম্বন্ধে এমন উদাসীন হয়ে থাকলে তার চলবে না। গোপনে দু'দণ্ড দেখা দেওয়া ছাড়া গৌর তাকে কিছু দেবে না সে জানে। তাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে বসবাস করার সাধ্যও বোধ হয় গৌরের নেই। সাধ থাকলেও ভরসা পাবে না। জানাজানি হবার আশঙ্কায় গৌরের মুখ সেদিন কি রকম পাংশু হয়ে গিয়েছিল চিন্তামণি তা ভুলতে পারে নি।

এই জ্বালাটাই তার বেশী। যোয়ান ছেলে, মা ছাড়া সংসারে কেউ নেই, কোথাও কারও কছে বাঁধন নেই কোনরকম, তার কেন এত ভয় তাকে নিয়ে ঘর করার, তাকে ভাত কাপড় দেবার ! পটলের অস্তিত্বই

সে একরকম ভুলে গিয়েছিল। চিঠিপত্র লেখা আর পড়ার কাজটা আজকাল তার গৌরই করে দিত—পটলের মত অনায়াসে অবশ্য নয়, অতি কষ্টে। প্রত্যেক চিঠির দু'দশটা কথা সে তো পড়তে পারে নি। চিন্তামণি যেচে পটলের সঙ্গে আবার আলাপ জমায়। বলে, 'কথাই দিকি বলেন না পটলবাবু।'

পটল বলে, 'যা তোমার দেমাক।'

মুখখানা কাঁদ' কাঁদ' করে চিন্তামণি করুণ সুরে বলে, 'দেমাক দেখলেন? আমার দেমাক? দুঃখী মানুষ আমি দাসীগিরি করে খাই—'

পটল তখন মুচকে হেসে বসে, 'না করলেই হয় দাসীগিরি!'

দিনের আলোয় মানুষটার মুখের পাকামির ছাপের মধ্যে চিন্তামণি সাংসারিক বাস্তব দেন-পাওনার সম্পর্ক গড়ে তোলার শক্ত পাকা বনিয়াদ খুঁজে পায়। এ যা নেবার নেবে, যা দেবার দেবে। তাদের দু'জনের কারো বলবার থাকবে না আদান-প্রদানে কোন দিন কোনপক্ষ ফাঁকি দিয়েছে। সম্পর্ক হবে সহজ সাধারণ, দিনগুলি কাটবে নিশ্চিন্ত স্বাভাবিক সুখে। গৌরের কাছে তো চড়া নেশা আর বুক ধড়পড়ানির আনন্দই শুধু মেলে। পর পর দু'রাত্রি গৌরের জন্য বড় বেশী মন কেমন করার যন্ত্রণা সয়ে চিন্তামণির মেজাজটা তাই আরও বেশী খিঁচড়ে গেল। দিনের বেলা খুঁজে খুঁজে যেচে যেচে আরও বেশী আলাপ করল পটলের সঙ্গে।

পরদিন বিকালে একখানা চিঠি এল চিন্তামণির নামে। পড়ে দেবার জন্য চিঠিখানা হাতে নিয়েই পটল পকেটে পুরে দিল।

'রাতে পড়ে শোনাব চিন্তামণি।'

'ওমা, রাতে কখন?'

চিন্তামণি

'অনেক রাতে, সবাই যখন ঘুমোবে। আজ এখানে শুয়ে থাকব, বৈটকখানায়।'

চিন্তামণির মনে হল, তাই হোক। গৌর কবে এসে পড়ে ঠিক নেই, আজ রাতেই বোঝাপড়া চুকে যাক পটলের সঙ্গে। সাতটা দিনও আর সে পার হতে দেবে না, নিজের ঘরে নিজের সংসার পাতবে। নিজের রান্না করবে নিজে, পরবে নিজের কাপড়, জল তোলা বাসন মাজা ঘর মোছা বিছানা পাতার কাজ করবে নিজের, রাতে পাশে নিয়ে শোবে নিজের পুরুষটিকে। কি জ্বালাতেই জ্বলে যাবে গৌরের বুক!

কি করবে গৌর?

সকাতর গৌরকে নানাভাবে কল্পনা করার চেষ্টায় সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়, অন্ধকারের সঙ্গে এক অজানা আতঙ্ক ঘনিয়ে আসে চিন্তামণির মনে। হিংসায় বুক ফেটে কি যাবে গৌরের? দুঃখে সে কি মুহ্যমান হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য? জীবনের সাধ-আহ্লাদ কিছুই কি তার অবশিষ্ট থাকবে না? কে জানে কি করবে গৌর! হয়তো হাঁপ ছেড়েই সে বাঁচবে যে যাক্, সব চুকেবুকে গেল! হয় তো দেখাই সে আর কোনদিন পাবে না গৌরের!

তা পাবে না। পটলের ভাড়া করা ঘরে গেলে কি করে সে গৌরের দেখা পাবে? এ বাড়ী ছেড়ে গেলে গৌরকেও তার ছাড়তে হবে জন্মের মত।

চিন্তায় ভাবনায় যেন অবল হয়েছে মনে হল চিন্তামণির। না খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। বৈঠকখানায় যাবে কি যাবে না স্থির করতে করতে রাত তিনটে বাজিয়ে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ক্রুদ্ধ পটলের কাছ থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে সে তোরঙ্গে

ভুলে রাখল। কাউকে দিয়ে চিঠিখানা পড়িয়ে শুনবার জন্য মনটা তার এমন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল যে চারদিন পরে তার মনে হল এ যাতনা সহ্য করা যায় না। গৌরের ভাবনার চেয়ে না-পড়া চিঠির জ্বালা তার বেশী হয়েছে।

পরদিন দুপুরে গৌর ফিরে এল।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি আমি বড়নিছিপুর আসিয়াছি জানিবা। না আসিয়া কি করিব আমার কে আছে আমাকে পুষিবে। পোড়া কপালে এত কষ্ট ভগবান কেন দিয়াছিল মরিয়া গেলে সুখ পাইতাম তা মরণ অদিষ্টে নাই। তুমি আমি দুই বইন মন্দ অদিষ্ট নিয়া জন্মিয়াছি। আমার সোয়ামি থাকিয়া নাই তুমি কচি বয়সে সিঁদুর মুছিলা। তুমি আটটাকা পাঠাইয়াছ তাহাতে কি হইবে জিনিষপত্র আগুণ হইয়াছে। বাবুরা শুদ্দ দিশা পাইতেছে না কি দিয়া কি করিবে। ছেলাপিলা মাগের ভাত কাপড় দিতে মাথায় হাত দিয়া কান্দে। তুমি আমাকে টাকা পাঠাইয়াছ তাতে কত সুখী হইয়াছি যে দিদিরে তুমি ভুলিলা না নিজে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইলা। নিজ বয়স বুঝিয়া সাবধানে চলিবা মন্দ লোক বুঝিলে কোন সংসর্গ রাখিবা না। পেটের খিদায় তুমি মধুবনী গিয়াছ ইহা আমারই অদিষ্ট। বড়নিছিপুরে আমি ভূষণ বাবুর বাসায় আসিয়াছি। ভূষণবাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের হালদার মশায়ের বড় জামাই তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়া-

ছিলাম কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রকাশ করি নাই। আমি ভূষণবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আছি। ইনি এমন ভালো লোক তাহা জানিতাম না। আমাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। খিদির পাড়ায় বাপের বাড়ী বৌ প্রসব হইতে আসিয়াছিল তাহাকে আনিতে আসিয়া বলিলেন যে হরমণি তুমি জানাশুনা লোক তোমারে চাকরাণী হইতে বলিতে পারিব না। তুমি খাওয়া পড়া পাইবা সব পাইবা আপনজনের মত ঘরে থাকিবা। বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া সব কাজ করিবা তাহাতে তোমার কিসের অপমান, আমার মা বৈন সংসারের কাজ করে না। তুমি জানিবা যে আমি নীচু জাতের মেয়ালোক আমার সহায় সম্পদ কিছু নাই ছাড়াও এখন না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছি তথাপি আমার মান রাখিলেন। ভূষণবাবুকে দেবতা বলিয়া জানিয়া পায় ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি। তাহাতে কিরূপ লজ্জিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন তুমি কেন কান্দিতেছ পায় ধরিতেছ কেন আমি নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছি ইহা কিছু নয় তিনি এরূপ দেবতা অপেক্ষা বড়। বড়নিছিপুরের যে মস্ত কারখানা আছে তাহাতে ইনি কাজ করেন। কারখানা তুমি কি দেখিয়াছ এখন কি হইয়াছে। সিংপাড়া গাঁয়ের চিহ্ন নাই সেখানে কারখানা বসিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া থ বনিয়া গিয়াছি।

আশির্ব্বাদিকা দিদি

ছয়

পৃথিবীতে বড় একটা যুদ্ধ বেধেছে খবর পেয়েছিল মধুবনী ও তার আশেপাশের সবাই। বাতাসে বাতাসে খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। তা যুদ্ধ যদি বেধে থাকে থাকুক, বিলাত দেশে যুদ্ধ বাধবে সেটা আশ্চর্য্যের কথা কি এমন, গরু শূয়োর মদ খাওয়া ম্লেচ্ছ জাত, রক্তগরম, মাথা গরম, ওরা তো যুদ্ধ করবেই যখন তখন। হিংস্র পশুর মত ও লালমুখো জাতের পরিচয় কি আর জানতে বাকী আছে কারো। ছাব্বিশ আর পঁয়ত্রিশ সালে বাপ বলানো গুঁতোর চোটে মর্ম্মে মর্ম্মে টের পেয়েছে সবাই। ওরা যদি হানাহানি কাটাকাটি না করে, করবে কারা ?

এই তো সেদিনও একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছিল ওদের নিজেদের মধ্যে। বেশীদিনের পুরাণো কথা নয় যে বুড়োদের শুধু মনে থাকবে, যোয়ানদেরও স্পষ্ট মনে আছে সে যুদ্ধের কথা। পুরো একটা যুগ ধরে ওরা কি হানাহানি করে মরেনি নিজেদের মধ্যে, সাবাড় হয়ে যায়নি বেশীর ভাগ পুরুষ ? মাঝখানে এতদিন যে ওরা যুদ্ধ করে নি সে তো শুধু এই জন্য যে যুদ্ধ করার পুরুষ ছিল না দেশে !

জিনিষ ওজন করা স্থগিত রেখে বাঁড়ুয্যে বলে, 'কথা তুললে যদি তো বলি শোনো রঘু। লড়াই থামলে সবাই দেখলো কি জানো ? দেখলো দেশ ভরা শুধু মেয়েলোক, বুড়ী মাঝবয়সী যুবতী কিশোরী সব বয়সের গাদা গাদা মেয়েলোক—পুরুষ যে কটা হাতের আঙ্গুলে গোনা যায়, তার আবার আদ্দেক কাণা খোড়া। সর্ব্বনাশ ! এ যে জাত শুদ্ধ লোপ পাবার যোগাড় ! সবাই মিলে তখন ঠিক করলে বিয়ে টিয়ে তুলে দাও, বল নাচ চালাও। বল নাচ জানো না ?'

রঘু, গৌর, নিতাই, পচা, সুবলদের অজ্ঞতায় আমোদ পেয়ে বাঁড়ুয্যে বেশী করে খ্যা খ্যা করে খানিকটা হেসে ফট করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয়।

বলে, 'বল মানে ফুটবল নয় হে, গর্ভ। বল নাচ গর্ভ ধারণের নাচ, আমাদের শাস্ত্রে যাকে গর্ভাধান বলে। যেদিন যত মেয়েছেলে মাস কাবারি চান করে, তারা সবাই সেদিন থেকে বল নাচের আসরগুলিতে যায়,—সেদিন থেকে দশদিন, ব্যাস্। যে কটা পুরুষ বেঁচেছিল যুদ্ধে, কাণা খোড়া সব শুদ্ধ বলনাচের আসরে থাকে। খানিক নাচানাচি হয়, তারপর—'

বাঁড়ুয্যে গম্ভীর হয়ে বলে, 'উপায় কি বলো, জাত কি লোপ পেয়ে যাবে? আমাদের গাই গরুর কথাই ধরো। এতগুলো গাই, ষাঁড় আছে কটা? গাই নিয়ে সবাই ছোটে একটা দুটো ষাঁড়ের কাছে, উপায় কি!' যুদ্ধ বেধেছে বাধুক। যুদ্ধের জন্যই যারা এমন করে বংশবৃদ্ধি করে, যুদ্ধ করে তারা ধ্বংস হয়ে যাক।

বিদেশে বিদেশীদের যুদ্ধ, মধুবনীর চাষীদের কি সম্পর্ক সে যুদ্ধের সঙ্গে? জাপান যুদ্ধে নেমেছে? জাপানও তো বিদেশী। বিলিতী মাল আসে মধুবনীতে, জাপানী মাল আসে। বিলাতও যেমন বিদেশ, জাপানও তাই।

বঞ্চিত নিষ্পেষিত জীবন এদের কাছে স্বাভাবিক সঙ্গত ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, সুদূরের বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করে ধীরে সুস্থে। কোনমতে বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলি এলোমেলো হয়ে থাকার চাপ। কোনদিকের চাপটা বাড়ে ক্রমে ক্রমে কোন দিকের চাপ অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে তাদের দিশাহারা করে দেয়। তেল নুন মশলার দোকানে

আধলা ছিদামের বিক্রী বন্ধ হওয়ার মধ্যে তারা ব্যক্তিগত ভাবে টের পায় যুদ্ধের ধাক্কা।

জিনিষের দর বাড়ে। কতগুলি জিনিষের দাম একেবারে হয়ে যায় চড়ক গাছ! কতগুলি দরকারী জিনিষ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় বাজার থেকে। সারা মধুবনীতে বিলেতী ফুড কেনার সমস্যা চাষীদের মধ্যে এক রঘু ছাড়া আর কেউ বোধ করে নি, কিন্তু লাঙলের ফাল, দা' কাস্তে পেরেকের সমস্যায় ভুগেছে অনেক চাষী। নিতাই কামারের হাপর বন্ধ নয়, কিন্তু হাপর চলেছে শুধু সারাইয়ের কাজে, কিছু তৈরী হবে না, লোহা নেই। বাজারের পুরানো লোহার কারবারী রামচরণ কদিন আগে হঠাৎ এসে ডবল দাম দিয়ে লোহার গুঁড়োটি পর্য্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে গেছে নিতাই-এর দোকান থেকে। নিতাই কি জানত তখন এমন ব্যাপার হবে? গরুর গাড়ীর একটা লোহার ডাণ্ডা রামচরণ কিনে নিয়ে গিয়েছিল সাড়ে পাঁচ-টাকায়, আড়াই টাকা লাভ হয়েছিল নিতাই-এর। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ীটার জন্য সেই ডাণ্ডা হরেকৃষ্ণ বাবু কিনেছেন তের টাকায়। সাড়ে সাতটাকা লোকসান নিতাই-এর!

লাজনতলার সোমবারের হাটে কাপড় কিনত চাষীরা, দাম আট দশ আনা চড়া দেখে দু'তিন হাট তারা কেনা বন্ধ রেখেছিল। পরের সোমবার গ্যাখে কি হাটে কাপড় এসেছে মোটে দু'চারখানা।

ইদুনাখার বরুল তাঁতি কেঁদে বলে, 'হায়রে ঝকমারি! একা বুনি দু'চারখানা, তাতে কি ভাই সংসার চলে? দশজনেরটা কিনে এনে বেচে আছি দু'চার গণ্ডা লাভ পেয়ে! শালা ছিনাত নন্দী টাকা দিয়ে সাপটে সব কিনে নিল; ভাবলাম বড় দাঁও মেরেছি। দেখবি যা নন্দীর ঠেঁয়ে, দু'য়ের তিনের কাপড়ের দর হাঁকছে সাত আট নয়। ইদিকে সুতো

পাইনে মাইরি। নন্দী বেটা বলছে সুতোর আমদানী নেই, কোথা পাব সুতো! কিছু আছে দিতে পারি, তা দর কিছু বেশী লাগবে। কি দর জানো? সোনার দর! আর সালে সোনা কিনিছি ওই দরে নেতার মার নাকছাবির জন্যে। তাঁত বন্ধ গাঁয়ে। সব কটা তাঁত বন্ধ। এ কি হল কাণ্ডখানা?'

এখানো কিছু কাপড় আছে বকুল তাঁতির ঘরে। দিবারাত্রি তার স্বস্তি নেই, ঘুম নেই। যে কাপড় বেচে দিয়েছে সামান্য কিছু বেশী লাভে তার জন্য আপশোষ, বাজারের দর দেখে বাকী কাপড় ছেড়ে দেবার তাগিদ, দর আরও চড়ছে দেখে অপেক্ষা করার লোভ, দর পড়ে যাবার ভয়—কত কি চিন্তা যে ঘুরপাক খাচ্ছে বেচারীর মাথায়! সাতান্ন জোড়া কাপড় একশো তেইশ জোড়া গামছা, দু'চারখানা গামছা আবার বেশী দরে কিনেও রেখেছে।

এসব অভ্যাস নেই বকুলের, বেশীদিন টিকবার সাধ্য তার হয় না। ভেবে ভেবে এমন মাথা ঘোরে আর বুক ধড়ফর করে তার, যে নন্দী বাবুর লোক এসে আরও আট আনা বেশী দিতে চাওয়া মাত্র সব মাল ছেড়ে দিয়ে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'মিলের কাপড় মেলা কষ্ট।'

'মিল কাপড়ের দর চড়িয়ে নিলে। এই ফাঁকে সুতো পেলে মোদের কিছু হত।'

চালের দাম বারো টাকা। ঘরে গৌরের চাল বাড়ন্ত, দুধ বেচা পয়সা নিয়ে চাল কিনতে গিয়ে সে শোনে, চালের মণ বারো টাকা, মোটা ভাঙ্গা চাল। আড়াই টাকায় গত ফসলের যে ধান সে নিজে বেচেছে, সেই ধানের চাল বারো টাকা!

রঘুর কাছে গিয়ে সে বলে, 'এত ভারি মুস্কিলের কথা হল।'

রঘু হেসে বলে, 'ভড়কে গেলি তো? চুপ করে থাক না কদিন। ভড়কানি খেলছে ওরা, যুদ্ধ লেগেছে খবর এয়েছে কিনা তাই ভেবেছে ভড়কিয়ে দিয়ে মেরে নেবে ফাঁকতালে। শালার বোয়ের মাই কিনা চাল, বারো টাকা মণ বেচতে চান যুদ্ধুর নামে। কোথায় যুদ্ধ কোথায় কি, মোর পান্তায় নেই কো ঘি। যেমন হাবা তুই, ঘাপটি মেরে থাক না বসে চুপ্‌টি করে দশটা দিন?'

'চাল যে বাড়ন্ত ঘরে, কিছু বোঝনা তুমি।'

'চাল বাড়ন্ত, চাল নে যা হু'কুনো। কথা কিসের অত?'

রেজকি যখন সবে কর্পূরের মত উড়ে যেতে আরম্ভ করেছে বাজার থেকে, গৌরের চাঁদকাকা একদিন শম্ভু সা'র দোকানে যায় তার মেয়ে পুঁটুর পায়ের মল সারাতে। ফিরে সে আসে চাপা উত্তেজনা আর মলের বদলে টাকা নিয়ে, কাগজের টাকা অবশ্য।

পুঁটু পোঁ করে কান্না ধরতেই চাঁদ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে চাপা গলায় গর্জ্জাতে থাকে, 'চুপ যা, চুপ যা বলছি হারামজাদি। টুঁ শব্দটি করবি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।'

মেয়ে ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে চুপ করলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে চাঁদ শুধোয়, 'কান্না কিসের শুনি?'

পুঁটু বলে, 'মল কই মোর? মল এনে দাও মোকে।'

'সারাতে দিলাম যে মল?'

পুঁটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলে, 'তবে যে বললে মাকে মল বেচে টাকা এনেছ?'

'কই বললাম? বলি নি তো। কি বললাম তুই কি শুনলি

আবাগীর বেটি।' মেয়ের সন্দেহ উড়িয়ে দেবার জন্য চাঁদ জোর করে' সস্নেহ কৌতুকের হাসি হাসে, মেয়েকে কাছে টেনে তার মাথা চাপড়ে বলে, 'পশু' মল এনে দেব তোর, পশু'। হা গ্যাখ মলের রসিদ দিয়েছে শম্ভু সা।'

পকেট থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বার করে চাঁদ মেয়েকে দেখায়। তারপর আর বিলম্ব না করে ঢক্ ঢক্ করে আধঘটি জল খেয়ে যায় পাশের বাড়ীতে কালাচাঁদের কাছে।

কালাচাঁদের অবস্থা বড় শোচনীয়। ক'বছর আগেও তার অবস্থা এখানকার অনেকের চেয়ে ভাল ছিল, সারাবছর একটি দিনের তরেও বৌ ছেলেমেয়ের তার পেটভরা খাবারের অভাব হয়নি। জোতদার করালী শাসমলের অতি বড় একটা অন্যায় মেনে নিয়ে আপোষ করতে রাজী না হওয়ায় তার হয়ে গেল সর্ব্বনাশ, মামলা মোকদ্দমায় আর একদিন অন্ধকার রাতে অজানা কার লাঠির আঘাতে ডান হাতটা দু'জায়গায় ভেঙ্গে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়ায়। কপাল মন্দ হলে যে সবদিক দিয়ে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে তার প্রমাণও কালাচাঁদ পেয়েছে, রোগের বাড়াবাড়িতে। অসুখ বিসুখ আগেও তার সংসারে ছিল, সব সংসারে যেমন থাকে, যার তাল সামলাতে রীতিমত খানিকটা বেগ পেতে হয় শুধু, কিন্তু দিন খারাপ পড়ার সঙ্গে জগতের সব রোগ যেন ভিড় করে আসছে শুধু তারই বাড়ীতে!

চাঁদ তাকে বলে, 'ঘেঁটুর মা কেমন আছে আজ কালাচাঁদ?'

কালাচাঁদ বাঁ হাতে চোখ কচলে একটা অস্ফুট শব্দ করে, কথার চেয়ে মানে যার বেশী স্পষ্ট।

চাঁদ একেবারে তামাক সেজে থেলো হুঁকোয় কল্‌কে বসিয়ে টানতে

টানতে এসেছিল, দাওয়ায় উবু হয়ে বসে হুঁকোটা সে এগিয়ে দেয় কালাচাঁদকে। খানিক একথা সেকথা বলে নিয়ে শুধোয়, 'পৈছেটা বেচে দেবে শুনছিলাম, দিয়েছো নাকি ভায়া ?'

দু'বছর যার সঙ্গে সে কথা কয়নি আজ তাকে চাঁদ ভায়া বলে !

'দেব আজকালের মধ্যে !'

'অ্যাদ্দিন বেচো নি ওটা, এ বড় আশ্চর্য্য !'

'ঘেঁটুর মা লুকিয়ে রেখেছিল। নিশ্চিত মরবে জেনে ভয় পেয়ে তবে না ফাঁস করলে। ওটা বেচে ডাক্তার আনব, ওকে বাঁচাব, সখ কত বাঁচার ! ডাক্তার এসে বাঁচিয়ে দেছে আমার ন'কড়ি, সাতকড়িকে, জন্মের মত বাঁচিয়ে দেছে ! এবার এসে বাঁচাবে ওকে !'

হুঁকোয় জোরে টান দিতে গিয়ে কাশির ধমকে দম আটকে আসবার উপক্রম হয় কালাচাঁদের, এক হাতে হাড় পাঁজর বার করা শীর্ণ বুকটা চেপে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে গিয়ে হুঁকোটা কাত হয়ে কল্কের আগুন ছড়িয়ে যায়।

'বেচবে যখন, দাও, আমিই কিনে নি।' কালাচাঁদ একটু সুস্থ হলে চাঁদ বলে, 'কিনতে একটা হবে আমার পুঁটুর জন্যে, পৈছে পৈছে করে ক্ষেপে গেছে একদম। বড়ও হয়েছে, বিয়ে শীগগির না দিলে নয়। তা ভাবছি কি, বিয়ের সময় করতে হবে একটা, দুদিন আগেই কিনি, মেয়েটা বায়না ধরেছে যখন। মজুরি বাদে যা পড়েছিল তোমার তাই দেব'খন। রূপো আছে কতটা ওতে ?'

কালাচাঁদ চুপ করে থাকে। তার পক্ষে উৎসাহের একান্ত অভাবটা বড় খাপছাড়া, বড় বিচ্ছিরি লাগে চাঁদের।

'নগদ দেব—সব টাকা নগদ। বাকী কিছু রাখব না।'

চিন্তামণি

'রুপোর দর খুব চড়েছে শুনলাম ?'

কথা শুনে চাঁদের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

'গৌর যাচ্ছিল কাল রাস্তা দিয়ে, ডেকে বললাম, ও বাবা গৌর, পৈছেটা বেচে দিবি বাবা কারো কাছে, দুটো টাকা যাতে বেশী পাই ? গৌর বললে রূপোর দাম বেড়েছে, দেড়গুণ দুগুণ টাকা। সা'র দোকানে দর কষিয়ে গৌর নিজে কিনবে বললে পৈছেটা। বলি বিয়ে টিয়ে করবে নাকি ভাইপো তোমার ?

'কি জানি।'

'শুধিয়েছিলাম। তা চাপা দিয়ে দিলে কথাটা। মন লাগে কি, বিয়ে টিয়ে করবে নয়তো পৈছে দিয়ে কি করবে ও, বৌ আছে না বোন আছে না মেয়ে আছে ওর ? যোয়ান ছেলে, তুমি তো দিলে না, পিথক হয়ে নিজেই জোগার করেছে বিয়ের। ছেলেটা ভাল চাঁদ, ওর ভালো হবে। দেখে নিও ভাল হবে তোমার ভাইপোর।'

সবাই তবে জানে রূপোর দাম চড়ার খবর ? কেন সবাই জানলো ভেবে বুকটা জ্বলে যেতে থাকে চাঁদের। সে একা না জেনে কেন সবাই জানল !

জ্বলতে জ্বলতে একটা কথা স্মরণ করে মনটা তার শান্ত হয়। মল কিনে সা' তাকে শুধিয়েছিল ; 'কাঁচা টাকা আছে চাঁদ ? থাকলে এনো।' কাঁচা রূপোর পুরানো টাকা, এডোয়ার্ড মার্কা, রাণী মার্কা টাকা। চাঁদ জানে তারই বাড়ীর ঘরের ভিটিতে মাটির তলায় পোঁতা আছে এক ঘটি পুরাণো টাকা, তার বুড়ী শাশুড়ীর চাটাই কাঁথার বিছানার নীচে।

প্রায় চারকুড়ি বয়স হবে চাঁদের শাশুড়ীর, কাঁকাল বাঁকা হয়ে সামনে নুয়ে গেছে, লোল চামড়া ঢাকা কঙ্কালসার দেহটা, লাঠি ধরে ছাড়া

দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তবু এই এক ভাবে বুড়ী দিব্যি টিঁকে আছে চাঁদের বাড়ীতে আজ পাঁচ বছর। তবু, টাকা ভরা ঘটিটা কোলে রেখেই বুড়ীকে একদিন স্বর্গে যেতে হবে জেনে এতদিন চাঁদ নিশ্চিন্ত ছিল! ধরতে গেলে ও টাকা তো তার নিজেরই সঞ্চয় বলা যায়।

সারাদিন চাঁদ চঞ্চল হয়ে থাকে ঘটিটার কথা ভেবে। একটা টাকার দাম হয়েছে এক টাকার বেশী, এমন কথা শুনেছে কেউ কোনদিন? এমন সুযোগ এসেছে কোন কালে? কে জানে ক'দিন থাকবে এই সুযোগ! আর শুধু কি এই একটা সুযোগ? রূপোর গয়নার কথাটাই ধর। সত্যি সত্যি কি আর দেশ শুদ্ধ লোক জেনে গেছে রূপোর দাম চড়বার খবর, রেলের কাছে মধুবনী বড় জায়গা, এখানে হয়তো জানাজানি হয়ে গেছে। দূরে ছোট ছোট গাঁয়ে হয়ত খবরও পৌঁছয় নি এ ব্যাপারের। মধুবনীরও সবাই হয়তো জানে না। গৌর চালাক চতুর, বাজারে যাতায়াত আছে, দশটা লোকের সঙ্গে মেলামেশা আছে, ওরা জানতে পারে। সবাই কি ওদের মত মধুবনীর? বোকাহাবা লোক কি নেই এখানে? রূপোর পুরাণো টুকিটাকি গয়না যদি সে কিছু কিনতে পারে ওদের কাছে থেকে! মাটির টাকাগুলো যা'কে বেচে লাভ হবে, টাকার বদলে পাওয়া বেশী টাকাটা এভাবে খাটিয়েও তার লাভ হবে!

চাষী চাঁদের মনে এই সব চিন্তা পাক খেয়ে বেড়ায়—অনভ্যস্ত এলোমেলো চিন্তা বলে একেবারে উতলা করে দেয় তাকে। রূপোর মল বেচে আশাতীত লাভ করেছে বলে শুধু এই পণ্যটির কথাই সে ভাবে, আরও কত কিছু কেনাবেচার মধ্যেও যে এরকম লাভের সুযোগ দেখা দিয়েছে সে সব তার মনেও আসে না, সোনার কথাটা পর্য্যন্ত নয়!

দেখা গেল, বুড়ীর ঘট চুরি করার কাজটা মোটেই সহজ নয়। ঘর

ছেড়ে বুড়ী বড় একটা কোথাও নড়ে না। বেশীর ভাগ সময় ঘরে বিছা-নায় শুয়ে থাকে, বাকী সময়টা ঘরেরই সামনে দাওয়ায় উবু হয়ে দু'পায়ের হাঁটু মাথায় ঠেকিয়ে বসে থাকে, কখনো আপন মনে বিড়বিড় করে, কখনো কাঁপা গলায় তারস্বরে চেঁচিয়ে একে ওকে গাল দেয়। নাইতে খেতে ও প্রকৃতির তাগিদে বুড়ীকে অবশ্য সরে যেতে হয় কিছু কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু চাঁদ ভরসা পায় না! বিছানা তুলে মাটি খুঁড়ে আবার গর্ত্ত বুজিয়ে এমন ভাবে বিছানা পেতে রাখতে হবে, বুড়ীর যাতে সন্দেহ না হয়। বুড়ীর অনুপস্থিতির সময়টুকুতে সেটা সম্ভব নয়।

'চণ্ডীতলায় পূজো দিতে যাবে বলছিলে না মা? তা যাও না, দিয়ে এসো পূজো।' চাঁদ বুড়ীকে জপায়।

হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বুড়ী বলে, 'মাথায় থাক পূজো দেয়া। অদ্দুর কি চলতে পারি? তুই যা না বাপ, দিয়ে আয়না পূজোটা?'

'বুড়ো মানুষ, সাধ হয়েছে, ডুলি করেই যাও। ডুলির পয়সা দেব'খন আমি। বিন্দেকে বলে দিচ্ছি।'

ডুলি চেপে চণ্ডীতলায় পূজো দিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বুড়ী চাঁদকে দিয়েই ঘরের দরজায় কুলুপ আঁটায়। শিকল কপাটের নীচের দিকে, কুলুপটা বুড়ী আবার নিজে টেনে ছাখে ঠিক মত লাগল কিনা!

ডুলি ভাড়া গচ্চা যাবার দুঃখের সঙ্গে নতুন নির্ঘাৎ মতলব ঠাউরাবার চেষ্টায় মাথা ঘামানোর পরিশ্রম মিশে প্রায় কাবু করে আনে চাঁদকে। ভাবতে হয় একা, বৌয়ের সঙ্গে যে একটু পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই। যতই হোক, সে তো মেয়ে বুড়ীর। বোকা মেয়েমানুষ, হয়তো গণ্ডগোল করে বসবে। বুড়ী চণ্ডীতলায় গেলে ছুতো করে বৌকে গৌরের

চিন্তামণি

রুপা মার খবর আনতে পাঠিয়ে কাজ হাঁসিল করবে ভেবে রেখেছিল। পুরাণো মর্চে ধরা এক কুলুপের জন্য সব ফস্কে গেল!

গৌরের গরুর দুধ কমে গেছে। নীলকণ্ঠবাবু চাঁদের কাছ থেকে এক-সের করে দুধ নেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ বাড়ীতে দুধ নিতে আসবার কোন তাগিদ চিন্তামণির ছিল না, কিন্তু সাধ করে গৌরের বাড়ী দুধ নিতে আসবার ভারটা নেওয়ায় এ বাড়ীতেও তাকে ঘুরে যেতে হয়। দুজনের বাড়ী বেশী দূরে নয়।

পরদিন সকালে চিন্তামণি এসেছে দুধ নিতে, চাঁদ চেয়ে ছাখে কি বিধবা মেয়েটা রূপোর পৈছে পরেছে বেহায়ার মত। ঘেঁটুর মার গায়ে যেটা লটকে থাকত এ পৈছেটাও যেন তারই মত!

'পৈছে দিল কে?' চাঁদ শুধোয়।

'কে দেবে, কিনিছি।'

'কার কাছে কিনলে? গৌরের কাছে নাকি?'

'অত খোঁজে কাজ কি তোমার? দুধ নিতে এইছি, দুধ দুয়ে দাও, নিয়ে চলে যাই!' চিন্তামণি ঝাঁঝালো সুরে জবাব দেয়। ঝোঁকের মাথায় সখের বশে পৈছেটা গায়ে চড়িয়ে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, ভোরের এই সুন্দর পৃথিবীতে সব মানুষ সব ভুলে তার এই গয়ণা-টির দিকেই শুধু তাকিয়ে থাকছে হাঁ করে।

'তোমার তো বড় মুখ বাছা?' বলে চাঁদ চুপ করে যায়।

রাত্রে পুঁটি তার দিদিমার কাছে শোয়। দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে সে কেমন এক খাপছাড়া ভীত কণ্ঠে ডাকে, 'বাবা।'

দুধ দোয়া স্থগিত করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদ বলে, 'কিরে পুঁটু?'

চিন্তামণি

'দিদিমা যেন কেমন করে শুয়ে আছে, ত্যাখোসে বাবা।'

'ডাক না?'

'ঠেললাম তো। নড়ে চড়ে না।'

তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে একনজর তাকিয়েই চাঁদ টের পায় বুড়ী মরে গেছে। বুকটা তার ধরাস করে ওঠে, মাথা ঝিম ঝিম করে। তার মনে হয় সেই যেন মনে প্রাণে জোরালো কামনা করে করে বুড়ীকে মেরে ফেলেছে। আর কি এ মরণ! রোগবালাই নেই, সাড়াশব্দ হৈ চৈ নেই, রাত্রে ঘুমের মধ্যে চুপি চুপি নিঃশব্দে স্বর্গে যাওয়া!

পুঁটু কেঁদে ওঠে, তার মা ছুটে এসে কান্নায় যোগ দেয়, আশেপাশের বাড়ীর লোক দু'চারজন এসে জুটতে আরম্ভ করে। দুধ আর চিন্তামণির নেওয়া হয় না। বুড়ীর শোকে চাঁদের দুধ দোওয়ার শক্তি লোপ পাওয়ার জন্য নয়, যে বাড়ীতে সদ্য সদ্য একটা মানুষ মরেছে সে বাড়ী থেকে দুধ নেওয়া চলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখে শুনে চিন্তামণি চলে যায়। ভাবে, গৌরকে খবরটা দিতে হবে।

বুড়ীকে পুড়িয়ে এসে চাঁদ খন্তা নিয়ে ঘটি উদ্ধার করতে যায়, পুঁটুর মা ডেকে বলে, 'ও কি করছ?'

'টাকার ঘটিটা বার করি মেঝে থেকে?'

পুঁটুর মা বলে, 'ওখানে ঘটি কই? ঘটি নেই ওখানে।'

চাঁদ অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় আছে তবে? এইখানে তো পোঁতা ছিল ঘটি?'

পুটুর মা বলে, 'শোন ইদিকে, বলছি সব। ব্যাপার আছে অনেক।'

ভূমিকা শুনে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় চাঁদের। তীব্র জ্বালাবোধের সঙ্গে সে ভাবে আশাভঙ্গের কি শেষ নেই তার?

চিন্তামণি

পুঁটুর মা বলে, 'ব্যাপারখানা কি জানো, ঘটি থেকে টাকাগুলো মা বার করে নিয়েছিল। বাবুকে বলে পোষ্টাপিসে জমা রেখেছে ওবছর। বলাই ঘোষের ঘর পুড়ে মাটির টাকাগুলো গলে তাল পাকিয়ে গেলো না সেবার, মা তখন ভয় পেয়ে গেল!'

টাকা তবে আছে? চাঁদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

'আমায় বল নি কেন?'

'তুমি যদি গোলমাল কর?'

কিছু হাঙ্গামার পর চাঁদ টাকাগুলি পেল—রূপার টাকা নয়, নোট। কাগজের নোট।

বিয়ে করা কচি বৌকে নিয়ে সংসার করার অস্পষ্ট সাধটা গৌর মামাবাড়ী থেকে আরও জোরালো করে নিয়ে ফিরে আসে। চিন্তামণির শক্ত বাঁধন কেটে নিজেকে সরিয়ে নেবার অস্পষ্ট ইচ্ছাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিন্তামণির সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবার কথা ভেবে মনটা বড় বেশী কেমন করায় তার ভয় বেড়ে যায়। এভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে চিন্তামণিই হয়তো শেষে তার সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পাইয়ে দেবে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যা থাকে কপালে বলে চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মনের অবস্থা তার ঘটিয়ে দেবে চিন্তামণি।

না, এ পিরীত টেনে চলে তার মঙ্গল নেই। সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে চিন্তামণির সঙ্গে।

বড় কষ্ট পাবে চিন্তামণি।

অদ্ভুত উল্লাসভরা গর্ব্ব অনুভব করে গৌর। তার জন্য চিন্তামণি পাগলিনী, সে বর্জ্জন করলে বুক চিন্তামণির ভেঙ্গে যাবে, চোখের জল

ফেলে ফেলে তার দিন কাটবে, একথা ভাবলে টনটনে একটা ব্যথা-বোধের সঙ্গে গৌরের পুরুষ মন অহঙ্কারে ভরে যায়।

ভোরে এসে চিন্তামণি শুধোয়, কেমন যেন ভাসাভাসা গাছাড়া গাছাড়া ভাবে শুধোয়, 'ফিরলে কবে?'

'কাল ফিরেছি।'

'ও। কাল ফিরেছ?'

তারপর চুপ করে থাকে চিন্তামণি, উদাস গম্ভীর মুখে। দুধ দুইতে দুইতে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকিয়ে গৌরের মনটা বিগড়ে যাবার উপক্রম করে। চিন্তামণির এ ভাব তার ভাল লাগে না।

'একটা কাজ করবে? চিঠিখানা পড়ে দেবে আমায়?'

*পাঠশালায় পড়া বিদ্যায় টানা হাতে লেখা চিঠি পড়তে গৌর গলদ-*ঘর্ম্ম হয়ে ওঠে। চিঠির সিকি অংশের বেশী পাঠোদ্ধার করার ক্ষমতা তার হয় না। দু'কান তার ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

চিন্তামণি টের পেয়ে বলে, 'ওই হয়েছে নাও। আমি তো ভাবছিলাম তুমি পড়তেই জানো কিনা! চাষার ছেলের পড়ার বালাই দিয়ে কাজটা কিসের?'

তারপর তাকে যেতে না বলে, ভালমন্দ সুখদুঃখের দুটো কথা না কয়ে, চিন্তামণি চলে যায়। তাতে আরও বিগড়ে যায় গৌরের মন।

ঠিক এমনিভাবে কেটে যায় কয়েকটা দিন, দু'দণ্ডের জন্য পরস্পরের দেখা হয়ে, ভাসাভাসা দুটো কথার বিনিময় হয়ে, আবেগ ও অন্তরঙ্গতা উহ্য থেকে। একদিকে গৌর স্বস্তি পায়, ভাবে এমনিভাবে চলতে থাকলে বিনা চেষ্টায় বিনা হাঙ্গামায় সম্পর্ক ভাঙ্গার ব্যাপারটা তাদের চুকে যাবে। অন্যদিকে ভিতরটা তার এক দুরন্ত ব্যথায় হু হু করতে থাকে। চিন্তা-

চিন্তামণি

মণিকে মনে হয় ম্লান, নির্জ্জীব! কি যেন দুঃখ বয়ে বেড়াচ্ছে সে, কথা-বার্ত্তা চালচলন চোখমুখের ভঙ্গি সব যেন তার বদলে গেছে সেই দুঃখের চাপে। ছেলে মরবার পর মেয়েলোকের এরকম শোকাতুরা মূর্ত্তি হতে দেখেছে গৌর। চিন্তামণিও কি নিজে থেকে সঙ্কল্প করেছে, বুক ফেটে গেলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবে?

এমনিভাবে দিন যাচ্ছে, একদিন কালাচাঁদের পৈছেটা গৌর নিজেই কিনে ফেলল একটা খেয়ালের বশে। বেচবার জন্য সা'র দোকানে পৈছেটা ওজন করাতে গিয়ে তার মনে হল, চিন্তামণিকে সে কখনো কিছু দেয় নি। চিন্তামণির মনে সে যে ভয়ানক কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছে, তার কাছে এই পৈছেটা পেলে কি সে কষ্ট কি কিছু কম হবে না?

পৈছেটা কিনে তার মনে হল, এই পৈছে দেওয়া উপলক্ষে শেষবারের মত একদিন চিন্তামণিকে একটু আদর করে দুটো মিষ্টি কথা বলা তার উচিত। পরদিন সে তাই নিজে থেকে সেধে চিন্তামণিকে বলল, 'আজ রাতে যাব?'

'যাবে? যেও।'

বৈন চিন্তামণি,

কতকাল তোমারে পত্র লিখি নাই ইহাতে মনে কষ্ট করিবা না নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় পত্র দিতে গৌণ হইল। আমি কাজ করিতেছি জানিবা। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কী দুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকাইত-গুলার দাসী হইলাম ইহা অদেষ্টে ছিল। কিরূপ হৈ চৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কত বাড়ী উঠিয়াছে অবাক কাণ্ড দেখিয়া তুমি চোখের পলক

ফেলিতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় গাদায় মাতাল গুণ্ডা গিজ গিজ করিতেছে। আমার মত শতাবধি পোড়াকপালী ঝির কাজ করিতে আসিয়াছে কাহারো ধর্ম্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে কোনমতে ধর্ম্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি। দুইস্থানে বাসন মাজিয়া তের টাকা করিয়া ছাব্বিশ টাকা পাই। যেরূপ কাণ্ড তোমারে আসিতে বলিতে ভরসা পাই না।

ইতি—তোমার দিদি

ছয়

গৌরের ঘরে আজ আবার চাল নেই।

মা বলে, 'ওবেলা হাঁড়ি চড়বে না গৌর। চাল বাড়ন্ত।'

আরও কয়েকদিন চলত, পুঁটুকে না খাওয়াতে হলে। কি ভাতটাই খায় এতটুকু মেয়ে! কম দিয়ে এড়িয়ে যাবার যো নেই, যতক্ষণ না পেট ভরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদে চলবে ভাতের জন্য। পেটমোটা ক্যাংটা পুঁটুর দিকে চেয়ে গৌরের মনে আজ আপশোষ জাগে যে চাঁদকাকা তার না খেয়ে মরে গেছে। বেঁচে থেকে আরও কিছুকাল তিলে তিলে তার মরা উচিত ছিল। বৌ আর ছেলে শুধু নয়, এই মেয়েটা চোখের সামনে মরবার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকা উচিত ছিল চাঁদকাকার। নিজের আত্মীয় এত বড় শত্রু হয় মানুষের? বেঁচে থাকতে আজীবন শত্রুতা করে গেছে, মরেও শত্রুতা করে গেল।

কতকাল না খেয়ে না খেয়ে পেট চিমসে হয়ে গিয়েছিল পুঁটুর,

হঠাৎ দু'বেলা বেশী বেশী ভাত গিলে মরতেও সে পারত। উচিত ছিল তাই। অথচ কাণ্ড খ্যাখো অদ্ভুত, কদিনে চেহারা যেন ফিরতে সুরু করে দিয়েছে মেয়েটার। মুখের বীভৎস শীর্ণতা থেকে মৃত্যুর ছাপ মুছে যেতে আরম্ভ করেছে।

পাতে ভাত কম ছিল, রোজ যা খায় তার অর্দ্ধেক। শেষ করে ভাত চাইতে মা একটু ইতস্ততঃ করে, কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। তারপর আরও ভাত এনে ঢেলে দিতে যায় গৌরের পাতে।

মা'র রকম দেখে খটকা লেগেছিল গৌরের মনে, দু'হাতে পাত ঢেকে সে বলে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর আছে তো ভাত ?'

'তুই খা না।'

কিন্তু তা কি হয়। মাকে উপোসী রেখে পেট ভরাতে পারার মত খিদের স্বাদ এখনো গৌর পায় নি। লোভে পড়ে শেষ পর্য্যন্ত কিছু ধান রঘু আর সে বেচে দিয়েছিল কিন্তু সে খুব বেশী নয়। তাদের দু'জনের বাড়ীতে তাই এখন পর্য্যন্ত দু'বেলা হাঁড়ি চড়ছে। গৌরের মন মুচড়ে গেছে আতঙ্কে, গরু ছাগলের মত চারিদিকে জানাশোনা মানুষগুলিকে মরতে দেখে, দিশেহারা হয়ে পালাতে দেখে দুদিন পরে তার কি অবস্থা হবে এই চিন্তায়। মোটামুটি পেট ভরে খেতে না পেলে হয়তো আতঙ্কে এতটা কাবু হয়ে পড়ত না গৌর। পেটের খিদে তার চিন্তা আর অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিত, বিরামহীন কল্পনার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এমন পাহাড় হয়ে চেপে বসত না তার মনে।

ধীরে ধীরে গৌর রঘুর বাড়ীর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। পা তার চলতে চায় না। পর হয়েও এ জগতে রঘুই তার সবচেয়ে আপনার, পরমাত্মীয়ের চেয়ে ঘনিষ্ট। তবু আবার রঘুর কাছে ধান বা চাল ধার

চাওয়ার কথা ভাবতেও তার কেমন বিশ্রী সঙ্কোচ হচ্ছে। রঘু দু'বার তাকে ধার দিয়েছে। মুখ ফুটে দেবনা বলে নি কিন্তু শেষবার কেমন যেন বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট মনে হয়েছিল রঘুকে, ধান মেপে দেবার পর ভাল করে কথা কয় নি। মুখ হাঁড়ি হয়ে গিয়েছিল বিরজার। বাড়ীর অন্য সকলের কথায় ব্যবহারেও একটা চাপা শত্রুতার ভাব গৌর অনুভব করেছিল।

কিন্তু উপায় কি। পয়সা কড়ি কিছুই নেই গৌরের হাতে। চিন্তা-মণিকে পৈছে কিনে দেবার সখ না জাগলে হয়ত গোটা কয়েক টাকা থাকত তার হাতে, আজ আবার গিয়ে হাত পাততে হত না রঘুর কাছে।

রঘু তামাক টানছিল দাওয়ায় বসে, চিন্তিত গম্ভীর মুখে। উঠানের এক কোণে মাঝারি পাত্রটায় ধান সেদ্ধ হচ্ছে। সুমিষ্ট চেনা গন্ধে গৌরের পেটের অল্প দুটি ভাত যেন চোখের পলকে হজম হয়ে গিয়ে দুর্দ্দান্ত খিদে পাক দিয়ে ওঠে। তাকে দেখে রঘু বিশেষ খুসী হয়েছে মনে হয় না গৌরের। হুঁকোটা দিয়ে অভ্যর্থনা করতেও সে যেন ভুলে গেছে। গৌরের মনে পড়ে, গতবার ধান দেবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত একটি বারের জন্যও রঘু খবর নিতে যায় নি সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

গলা শুকিয়ে যায় গৌরের। আরও একটা নতুন আতঙ্ক তাকে প্রায় দিশেহারা করে দেয়। রঘুও কি সত্যই তাকে ত্যাগ করবে তার বিপদের দিনে? নিজেকে কি যে অসহায় মনে হয় গৌরের! আজ সে ভাল করে টের পায়, চিরটা কাল সে কতখানি নির্ভর করে এসেছে রঘুর ওপর, এখনো সে কতটা ভরসা রাখে ওর কাছে। ধান আজ চাইবে কি চাইবে না ভেবে পায় না গৌর। ধান চাইলে যদি ভেঙ্গে

যায় তাদের বন্ধুত্ব, সম্পর্ক চুকে যায় আজ থেকে? যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐই সত্যটা যে সাহায্য দূরে থাক, রঘুর কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার আশাও তার নেই? অথচ কথাটা আজ স্পষ্ট করে না নিলেই বা তার লাভ কি! রঘু যদি তাকে বরবাদ করেই থাকে, সেটা জানলে তার কি আর বেশী ক্ষতি হবে?

এলোমেলো ছাড়া ছাড়া কথা হয় দু'জনে। নিজেই হাত বাড়িয়ে গৌর হুঁকোটা নেয়।

বলে, 'কদিন চলবে আর এরকম?'

রঘু বলে, 'ভগমান জানে। নিতায়ের মেয়েটা নাকি কোথায় ভেগেছে কাল।'

'মাইরি বলছিস্? কার সাথে গেল?'

'ভগমান জানে। পটল নাকি পিছনে ছিল শুনলাম—সহরে সরিয়েছে।'

বিরজা এসে ঘুরে যায়। ধান কেমন সেদ্ধ হচ্ছে দেখতে। খানিক পরে আবার আসে। মনের কথাটা ধৈর্য্য ধরে আর সে চেপে রাখতে পারে না।

'কি শলা হচ্ছে শুনি তোমাদের? ধান যদি চাইতে এসে থাকো গৌর ঠাকুরপো—'

গৌর সজোরে মাথা নাড়ে।—'না, ধান চাইতে আসি নি।' তারপর অন্তরঙ্গের মত হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'চাই যদি, দেবে না? বল কি গো! আমি চাইলে দেবে না?'

এ যেন তামাসার ব্যাপার!

বিরজা বলে, 'থাকলে কি দিতে অসাধ? কোথায় পাব যে তোমায় দেব! আধপেটা খাচ্ছি সব—মুঠি মেপে চাল নিচ্ছি।'

তবু গৌর কথাটাকে গায়ের জোরে তামাসার পর্য্যায়ে রাখতে চেষ্টা করে, হাল্কা হাসির ভান করে বলে, 'আমার জন্যেও নিও বৌঠান আজ থেকে। বিশ মুঠো নিও, তাতেই হবে, বেশী চাই না।'

রঘু বলে, 'ধান যদি কিছু যোগার করতে পারিস গৌর—'

'যোগার কিসের? গোলা ভর্ত্তি ধান রয়েছে।'

'তামাসা নয়! ধান পেলে কিছু কিছু শোধ দিস তোর কাছে যা পাব।'

বিরজা যোগ দেয়, 'একটা পেট তোমার—মা বুড়ী আর কতই বা খায়? তোমার ভাবনা কি বলো। এত লোকের সংসার হলে টের পেতে!'

গৌর তবু হাসে।—'বড়লোকের বড় সংসার! আমার মত বড়লোক যদি হতে—'

মন এদিকে তার পুড়ে যেতে থাকে। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সে একরকম পালিয়ে আসে রাস্তায়।

দুপুরের রোদে যেন উজ্জ্বলতা নেই, শুধু ঝাঁঝ। দু'চারটি জীবন্ত কঙ্কাল শুধু চোখে পড়ে—মানুষ ও গরুছাগল, ঘোষেদের কেলো কুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা আর কালাচাঁদের শূণ্য ভিটে খাঁ খাঁ করছে। চারিদিকের প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিজেকে গৌরের আরও বেশী একা, আরও বেশী অসহায় মনে হয়।

মনে হয়, চিন্তামণির সঙ্গে যদি ভাব রাখত! প্রাণখুলে মনের দুটো কথা কয়ে নিজেকে হাল্কা করা যেত একটু। আজ তিনচার মাস চিন্তামণির সঙ্গে সে দেখা করে নি, কথা কয় নি। রঘু আজ যে ভাবে

বর্জ্জন করেছে তাকে, একরকম এমনি ভাবেই সেও সম্পর্ক তুলে দিয়েছিল চিন্তামণির সঙ্গে। অবশ্য পৈছেটা সে দিয়েছিল চিন্তামণিকে— দামী ভারী একটা পৈছে! সে চাওয়ার আগেই রঘু তাকে জানিয়ে দিয়েছে ধান সে তাকে দিতে পারবে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মত সেই সঙ্গে ধার দেওয়া ধান শোধ চাইতেও তার বাধে নি।

আচ্ছা, চিন্তামণির কাছে সে যদি পৈছেটা ফেরত চায়? যদি বলে যে এখনকার মত ওটা ফেরত দাও, সুদিন ফিরে এলে আবার তোমায় নতুন পৈছে গড়িয়ে দেব?

বিয়ে করে ঘরসংসার করার সাধ মেটাবে বলে যাকে সে ত্যাগ করেছে, এতকাল একটা খবরও নেয় নি যে বাঁচল না মরল, তার কাছে পৈছে ফেরত চাওয়ার কথা ভাবতে গৌরের লজ্জা বোধ হয় না। বরং রঘুর কাছে ধান চাইতে যাওয়ার চেয়ে একাজটা বরং ঢের বেশী সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এমন কি, পৈছে দিতে চিন্তামণি যে অস্বীকার করতে পারে এটা তার খেয়ালও হয় না একবারের জন্য। তার যেন দাবী আছে পৈছেটাতে এবং চাইলেই যেন চিন্তামণি বিনা দ্বিধায় সেটা তাকে ফিরিয়ে দেবে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই এতটুকু। অসঙ্গতিও নেই।

চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর আজ প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে গৌর তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। এমন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে যে বাবুদের বাড়ীর খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বাবুর মেয়েটাকেই অনুরোধ জানায় চিন্তামণিকে ডেকে দিতে।

চিন্তামণি আসে অনেক দেরী করে। একটু রোগা হয়ে গেছে

চিন্তামণি। রোগা হওয়ায় আরও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, কম মনে হচ্ছে বয়স।

চিন্তামণি এসে গৌর মুখ খুলবার আগেই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'বেশ করেছ এসেছ। তোমায় খুঁজছিলাম ক'দিন থেকে। তোমার গয়ণা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

চিন্তামণি পৈছেটা গৌরের হাতে তুলে দেয়।

'ফিরিয়ে দিচ্ছ ? কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ ?'

'যে ব্যাভারটা করলে তুমি, তারপর তোমার জিনিস নেব ?' চিন্তা-মণির গলা ধরে আসে, 'মাসকাবারে দেশে ফিরে যাব। তোমার জিনিষ তোমার থাক, আমার কাজ নেই ওতে।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে গৌর চিন্তামণির হাত চেপে ধরে, মিনতি করে বলে যে চিন্তামণি যদি তাকে ছেড়ে দেশে চলে যায় সেও তাহলে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে ঘর ছেড়ে নয়তো আত্মঘাতী হবে। আর সে এমন ব্যবহার করবে না চিন্তামণির সঙ্গে। চিন্তামণি মাপ করুক তাকে।

দুপুরবেলা খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে গৌরের কথা শুনতে শুনতে চিন্তামণির মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন মনে হলেও রোমাঞ্চ হয় চিন্তামণির।

পৈছের টাকায় কিছুদিন গেল। তারপর গেল জমিজমা ঘরদুয়ার বাসনপত্র। তারপর গেল পুঁটু ও গৌরের মা।

চিন্তামণি বলল, 'এখানে থেকে কেন শুকিয়ে মরবে ? তার চাইতে চল বড়নিছিপুরে দিদির কাছে যাই। মস্ত কারখানা হয়েছে, তুমি কাজ করবে আমি কাজ করব, একরকম করে চালিয়ে নেব দুজনে মিলে।

সেথায় তো জানা চেনা কেউ নেই তোমার, একসাথে থাকতে ভয় পাবে না তুমি।'

গৌর বলল, 'ভয়? কিসের ভয়? এখানেই একসাথে থাকছি এসো না আজ থেকে।'

আজ গৌরের আত্মীয় নেই, ঘরবাড়ী নেই, জমিজমা নেই, পেটে ভাত নেই—কাকে তার ভয়, কিসের তার লজ্জা।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি,

তুমি আসিতেছ জানিয়া কিরূপ সুখী হইয়াছি তাহা কিরূপে বলিব। মনে খালি ডর পাই যে তোমার কাঁচা বয়স, পুরুষ রক্ষক না থাকিলে না জানি কি বিপদে পড়িবা।........

সমাপ্ত